কৃশানু

কৃশানু

মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক
৬ষ্ঠ বর্ষ। ২য়-৩য় সংখ্যা
১৩৮০-৮১

সূচী

কৃশানুর ব্যথা ॥

শক্তি মুখোপাধ্যায়। যাবার সময় শেষবার ॥ কাত্তিক মোদক। শীতের রোদ্দুরে নীলকণ্ঠ পাখি ॥ স্বপন চক্রবর্তী। অন্ত খেলা ॥ মিহির দেববর্মণ ॥ শেষকড়চা। বিজয় মিত্র। ইচ্ছেরা কারাবাসে ॥ ঈশ্বর ত্রিপাঠী। সাপুড়ে ॥ জয়া রায়। দুর্ভাগ সময় ॥ সমীর উপাধ্যায়। শমন ॥ রত্নেশ্বর বর্মণ। চারটি গল্প। ৭৯ ॥ দীনেশচন্দ্র সিংহ। কবি-কাহিনী। ১২১ ॥ কিরণ চন্দ্র মৈত্র। জীবন যখন শুকায়ে যায়। ১৩২ ॥ সুনীল বসু। সবুজ উদ্যান সবুজ উপত্যকা। ১৩৭ ॥ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। হেটো বই-হেটো ছড়া-হাটে হাঁড়ি। ১৪৫ ॥ নতুন নাটক ॥ যাঁরা চলে গেলেন ॥

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র সিংহ

কৃশানু

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির ৮নং ধারানুযায়ী বিজ্ঞপ্তি—

১। প্রকাশের স্থান—৩০।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশের কাল—ত্রৈমাসিক।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম—শ্রীমলিন দত্ত, জাতীয়তা—ভারতীয়, ঠিকানা—রামকৃষ্ণ পল্লী, পোঃ—বাটানগর, জিলা—২৪ পরগণা।

৪। সম্পাদকের নাম—শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ, জাতীয়তা—ভারতীয়, ঠিকানা—দৌলতপুর, পোঃ—চটাকালিকাপুর, জিলা—২৪ পরগণা।

৫। মালিকগণের নাম ও ঠিকানা : (ক) মলিন দত্ত, রামকৃষ্ণ পল্লী, বাটানগর, ২৪ পরগণা। (খ) মদন দাশ, ৬০।২, ব্যানার্জী বাগান লেন, হাওড়া। (গ) হরিপ্রসাদ ভৌমিক, ই, এইচ ১।২১, বাটানগর ২৪ পরগণা। (ঘ) দীনেশচন্দ্র সিংহ, দৌলতপুর, চটাকালিকাপুর, ২৪ পরগণা।

আমি, শ্রীমলিন দত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ, ১৫ই মে, ১৯৭৪

স্বাক্ষর—মলিন দত্ত
প্রকাশক

With best compliments of :—

BENGAL TRADING CORPORATION

127N, Maniktala Main Road,
Calcutta-54
Eagineers and Contractors

Phone : 24-6697

With best compliments of :—

RONALD ENGINEERS

3/3D, Kadamdanga Road

Calcutta-46

('RONALD' DOOR CLOSER)

With the best compliments from :—

Phone : 35-2808

LA ELEKTROAMPS

22-C, Motilal Basack Garden Lane,

Kakurgachi

Calcutta-54

With Best Compliments of :—

NEW ALIPORE MARKET

TRADERS MARKETING SOCIETY

NEW ALIPORE MARKET

CALOUTTA-53

বেরিয়েছে—

সুর দাসের—

* রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে ৮·০০

সরকারী শিল্প বাণিজ্য সংস্থাগুলির কাজ-কারবার এবং সমস্যাবলী সম্পর্কে বাংলা প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

* পলাশের রঙ ৪·০০

শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত

এগারজন তরুণ গল্পকারের গল্প সংকলন

* সময়ের কণ্ঠস্বর ৫·০০

মদন দাশ, প্রভাসকান্তি ভদ্র, রত্নেশ্বর বর্মণের গ্রন্থ

* গল্প ৫·০০

দশজন তরুণ গল্পকারের গল্প সংকলন।

* গল্প দশক ৩·০০

নারী ভূমিকা বর্জিত হাসির নাটক

* লাভার্স লেন ৩·২৫

মদন দাশ ও প্রশান্ত রায় এর কাব্যগ্রন্থ

* বেঁচে থাকা দু'জনে ৩·০০

লিপিকা

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৩০।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মদন দাশ
প্রভাসকান্তি ভদ্র
রত্নেশ্বর বর্মণ
এই তিন তরুণ গল্পকারের নিশ্চিত পরিচিতি এনে দেবে
গল্প
দাম : পাঁচ টাকা

দশজন তরুণ গল্পকারের দশটি গল্প
গল্প দশক
দাম : তিন টাকা

"দশকের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে এঁরা কোন স্বেচ্ছাচারিতা ও উন্মার্গগামিতাকে স্লোগান হিসেবে তুলে ধরেননি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই গল্প লিখতে চেয়েছেন বেশ অন্যভাবে নিজেদের মতন করে; দৃষ্টিভঙ্গিতেও এঁরা আধুনিক, কম-বেশী বক্তব্য রয়েছে। সব মিলিয়ে সংকলনটিতে বেশ তাজা স্বাদ।"—দেশ
"এ গ্রন্থের গল্পকাররা কিছু কিছু পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প লিখেছেন—বুদ্ধিজীবী পাঠক তা থেকে অভিনবত্বের আস্বাদ পাবেন। গল্পগুলি স্বভাবে ছোট গল্পের মর্যাদাসম্পন্ন, অকারণ কাহিনীবর্জিত নীরস প্রতীকী তত্ত্বকথা বাচালাকি যে নয় তার প্রমাণ আছে।"—অমৃত

সমকালীন সমস্যা অবক্ষয় এবং অসুস্থ মানসিকতার
চূড়ান্ত বাস্তব চিত্রসমষ্টি
সময়ের কণ্ঠস্বর
প্রতিটি পাঠককে নিশ্চিত ভাবিয়ে তুলবে
দাম : পাঁচ টাকা

লিপিকা ৩০।১এ, কলেজ রো। কলিকাতা-৯

যাবার সময় শেষবার

শক্তি মুখোপাধ্যায়

তুমি তাহলে একরকম স্থির করেই নিয়েছো
আজ এই বিকেলের আলোতেই শেষ দেখাদেখি।
এখন আর ভাবতে বসলে কূল পাবো না কেউ
অথবা কারণ খুঁজতে যাবো না কি করে আমরা
এত তাড়াতাড়ি পরস্পরের কাছে ভেতো হলাম!
ছেড়ে যাবে বলে তুমি যতটা সম্ভব বিভাজন
নিজেই করেছো জানি তবু খুঁত থেকে গেছে কিছু;
যেমন কি করে ভাগ করবে বলো যে গোলাপগাছ
তোমার যত্ন পেয়ে শিশুকাল থেকে যৌবনে
পৌঁছে এখন পূর্ণ সৌন্দর্য বিস্তারে নিয়োজিত!

যে পোষা বেড়ালটাকে আদরে আব্দারে তুমি রোজ
মাথায় তুলেছো তার ভবিষ্যৎ ভাগ হবে কি সে?
অথবা পিঞ্জরে প্রিয় পাখিটাকে ভোলানো কি যাবে
যখন উচ্চারিত হবে সুমিষ্ট কণ্ঠ থেকে কাল
তোমারই শেখানো বুলি 'বউ রাণী ওগো বউ রাণী'!

তুমি চলে গেলে কাল ঝরে যাবে সমস্ত গোলাপ
সবুজ পাতায় দুঃখ-অশ্রুপাত ভোরের শিশিরে;
এক বুক কান্না নিয়ে গোঁফঅলা বেড়ালটা কাল
ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে দু'ঠোঁট ফুলোবে অবশেষে
অথবা খাঁচার পাখি যন্ত্রণায় ডানা ঝাপটাবে।

ঘরের ভেতরে বলো বাহির উঠোনে, দরোজায়
সব স্থানে স্মৃতি রেখে যাবার সময় শেষবার
ভেবে দেখো হৃদয়ের ডানা মেলতে পারবে কিনা।

শীতের রোদ্দুরে নীলকণ্ঠ পাখি

-কার্তিক মোদক

মাঝে মাঝে শিমুলতলায় মানুষদের কথা বড় বেশী মনে হয়
কিশোর বয়সের স্মৃতিগুলো টেলিগ্রামের মতো
হঠাৎ চমক দেয়
আমি বুঝতে পারি তোমাদের কণ্ঠস্বর
ভেসে আসছে কুঠির ছায়ায়
স্বপন সমর অমিত বুদ্ধদেব-এর অদৃশ্য ভালবাসা
ধবল কুয়াশায় ইছামতীর জলের ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়
দীর্ঘদিন শিমুলের ছায়ায় কানামাছি খেলা বারোয়ারী তলায়
অন্ধকার গোলক ধাঁধায়
মন্দিরে ধর্ণা দিই
ভ্রষ্ট স্বর্ণচাপায়
চন্দন কাঠের বনে মুগ্ধ দু'একটা মুহূর্ত হঠাৎ অজ্ঞাতবাস
থেকে ছাড়পত্র নিয়ে আসে দুর্যোগের রাতে
নাট মন্দিরের চত্বরে চড়কের
গাজন উৎসব
কোলাহল থেমে যায় রোমাঞ্চকর অধ্যায়
আলোকিত অঙ্গনে ঢেকে রাখে শৈশব,
আমি যেখানেই যাই পিছু পিছু তাড়া করে কিশোর বয়স
শীতের রোদ্দুরে নীলকণ্ঠ পাখি শিমুলতলায়।

অন্য খেলা

অপন চক্রবর্তী

লুঠেরার লুঠ শেষে ফলের বোঁটা থেকে ঝরতে থাকে শ্বেত কষ
দেউড়ি পেরিয়ে এইসময় কোমরের বেল্ট খুলে
পুরাণো অভ্যাস ঝালিয়ে নেয় চৌকিদার
কিছুই ধরে যায় না রাখা
কুমারীর শরীরও একদিন ধূপধূনোর মত পুড়ে যায়
সংরক্ষিত বনের পরীর চিঠিতে লেখা থাকে প্রিয় হরিণের জন্ম
এইভাবে শবানুগমনের সময়
চিকন আর্তনাদ
হরিদ্রুঠ ছিটানোর মত দমকা বাতাসে উড়ে যায় প্রাত্যহিক স্মৃতির খই
শুধু লুঠেরাই নয় বসুধাও নিজ প্রয়োজনে রিক্ত হবার খেলায়
নরম আঙুলে তুলে নেয় বাহার তাসের তিন তাস
নইলে নতুন সবুজ উদ্ভিদ হবে কোথায়

শেষ-কড়চা

মিহির দেববর্মণ

তার জনাছয়েক সাগরেদ মিলে
লোকটাকে নিয়ে গিয়েছিল।

কোত্থেকে যে ওরা বাঁশ দড়ি দড়া
এমন কি একটা পাহাড়ী ফুলের মালা জুটিয়েছিলো
তা ওরাই জানে

পাকদণ্ডী বেয়ে অনেক নিচে নামতে নামতে
আকাশে ধ্বনি ছুঁড়ে দিয়েছিল, বলহরি, হরি বোল

তারপর ? আগুন জিভ দিয়ে মড়াটাকে চেটেপুটে শেষ করে ফেলল।
ছটা মুখ চিতাটাকে ঘিরে রাখল প্রহরীর মতো

ভাড়ির ঘোরে একজন বলে উঠল
শুরু শালা বেজন্মা, আমাদের জগ্‌ মেরে
কেমন পালিয়ে গেল !

মুহূর্ত না পেরোতেই বারোটা চোখের চিতায়
আগুনের মতো তীব্র কান্না দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

ইচ্ছেরা কারাবাসে

বিজয় মিত্র

ইচ্ছেরা সততই নিজের মধ্যে অন্তরীণ
সোচ্চার কিম্বা অনুচ্চারিত যে কোনো শব্দকল্পেই
বিরামবিহীন সেই একই ধ্বনি
তরঙ্গায়িত উপকূল-প্রান্ত-সীমায়
ভেদাভেদে শুধু সংখ্যারূপ বিবিধের পরিধি বিস্তার
আবর্তন চরিত ও মানসিকতায়
নতুন নতুন সংযোজনের ধারাবাহিকতা

সংঘাতে আগ্রত অভিলাষ
জলোচ্ছ্বাসে বাসনার নদী ক্রমেই স্ফীত
অবরুদ্ধ জৈব ক্রিয়ায়
অন্তাবধি নিয়মের কর্মধারায়
স্ব স্ব মুদ্দিয়ানার ফের
সংলাপে বিচিত্রকামী
ইচ্ছে বহুবিধ স্বকীয় চরিত্র সাজে আগুত
মিছিলে মেলা ঘুরে একাধিকবার যাত্রান্তর
শুধু দৃশ্য খোঁজে—
পায়ে পায়ে অন্তর্দশা তত্তক্ষণে ইচ্ছেরা কয়েদী
আপাত অপরাধে তুল্যমূল্য
শ্রেণীবদ্ধ বুদ্ধির বিচার
অবিরত মাথা বুকে নিয়ে এইরূপ
দণ্ড-পল-মুহূর্ত প্রতীক্ষ সময়
ইচ্ছেরা কারাবাসে মুক্তি গোনে
পূণর্বার পর্যায়ক্রমে।

সাপুড়ে

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

যে পারে খেলাতে সাপ সেই পারে, অন্যেরা পারে না।
জড়িবুটি তারই কাজে লাগে যে জানে মন্ত্রের ব্যবহার।
যে পারে চালাতে বিষ সেই শক্য শত্রুর সংহারে
যে পারে নির্ভয় হতে নির্বিশেষে,
ভয়াল সৌন্দর্য তার হিল্লোলিত হাতের মুঠিতে।

গর্তের আড়ালে থাকে শব্দগুলি অপটু হাতের স্পর্শে হিস্ হিস্ ধ্বনিতে মুখর
যে জানেনা ভীত্ ভীত্ সে কেবল খেয়ে যায় স্নায়ুকেন্দ্রে শব্দের ছোবল
শব্দেরা খেলেনা তার হাতে, শব্দগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে
কুৎসিৎ কেউটের মত পড়ে থাকে জরদ্গব ঝাঁপির ভিতর।

যে পারে খেলাতে শব্দ সেই পারে, অন্যেরা পারেনা
অন্ধিসন্ধি সেই জানে যার রক্তে থেকে গেছে অনিবার্য সাপুড়ে সংস্কার॥

সমন

সমীর উপাধ্যায়

শপথ করেছিলাম একদিন,
আমার উদ্দাম জয়যাত্রার চিহ্ন—
এঁকে দেবো তোমার
সিঁথিতে।
আমার সেই দম্ভ
বিলুপ্ত আজ।
কিছুক্ষণ আগে, প্রজাপতির ছবি নিয়ে
একটা সোনালী কার্ড দিয়ে গেল
পোস্টম্যান।

দুভাগ সময়

জয়া রায়

সে আমায় বলেছিল,
নিজেকে সুখী ভাবলেই তুমি সুখী।

গতকাল আমার ন' বছরের
ছেলেটা মারা গেছে,
আজ ভাবছি আমি খুব সুখী।
চোখে জল এলে চোখ দুটো কচলে
হেসে বলছি, "একটু ধুলো ঢুকেছিল কিনা।"
বিশ্বাস করুন, আমি নিজেকে
সত্যি সত্যি সুখী ভাবছি।
হঠাৎ শুনে অবাক হই,
গুনগুনিয়ে বলছে সে, "এতটা আবার ভালো নয়,
তয়জাজা ছেলেটা মরে গেল,
মা তো নয় খোদ ডাইনী।"

আমি কেঁদে ফেলি।

সদ্য মৃত ছেলেটা কানে কানে
বলে যায়, ঘড়ির কাঁটা দিয়ে
সময়টা ছিঁড়ে দু'ভাগ করো।
তারপর এক ভাগে হয়ে যেও সুখী
অন্যভাগে রেখ বুকের দুঃখ।

রত্নেশ্বর বর্মণের চারটি গল্প

ক্রুশবিদ্ধ যীশু ও সোনার হরিণ
বীথি চলে গেছে
তিন পকেটমার ও বিলাসী
জীবন যে রকম

ক্রুশবিদ্ধ যীশু ও সোনার হরিণ

শিয়ালদায় নেমেই দেখি যানবাহন সব এখানে ওখানে এলোপাথাড়ি স্থির হয়ে আছে। এদিকে ট্রেনটাও লেট করেছে ভীষণ। বেলঘরিয়া থেকে শিয়ালদা আসতে দেড়ঘণ্টা। অবশ্য এমন কিছু নয়, আজকাল আকছার এমনটা ঘটছে। এমন একদেড় ঘণ্টা লেট গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু ট্রাম বাসের এমন অবস্থা দেখে মেজাজটা বিগড়ে গেল। আমার একটা চাকরির দরকার। কেননা বয়সটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। একটা ভবিষ্যৎ আছে তো। অর্থাৎ এখন যদি একটা চাকরি পাই, তবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাকাপোক্ত ভিত তৈরী হতে পারে। এর মধ্যেই শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে প্রায় মধ্য যৌবনে পৌঁছে গেছি। আর আমাদের ভারতবর্ষে যৌবনটা যেমন আচমকা আসে তেমন দ্রুত অন্তর্ধান করে। সুতরাং আর্যোক্ত থিসিস মেনে চললে, আমার আগামী জীবনের একটা ছক কেটে নেওয়া যেতে পারে। এর পরই গার্হস্থ্য তারপর বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস কিছু নেই মশায়, শুধু গার্হস্থ্য — ভোজন-প্রজনন, প্রজনন-ভোজন···। আমার বাবা এমনি কাটাচ্ছেন. ঠাকুরদাদা. তস্য বাবা এমনি কাটিয়েছেন। এর চেয়ে মহত্তম করণীয় কিইবা আছে।

আজ এগারটায় আমার একটা ইন্টারভিউ আছে। তাই নিজেকে একটু চাঙ্গা চাঙ্গা লাগছে। তা না হলে মমির মতো যেন ক্রমশ জমে যাচ্ছিলাম। ইদানীং ইন্টারভিউও পাওয়া যাচ্ছিল না। বকস্ নম্বরের ঢালের আড়ালে আত্মগোপনকারী চাকুরিগুলি লক্ষ্য করে চিল ছোঁড়ার মতো ধৈর্য আর ছিল না। সরকারী চাকুরির যে সমস্ত বিজ্ঞপ্তি বের হয় তাও ছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং এমন হতাশার মধ্যে যখন নিমজ্জিত ছিলাম. তখন এই ইন্টারভিউর চিঠিটা হাতে এল। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, বৌবাজারের রাস্তা ধরে সামনের দিকে। বিপুল জনস্রোতের মধ্যে আমিও ভেসে চলেছি। বেশ লাগছে। একটু আগে ট্রাম বাস বন্ধ থাকার জন্য যেটুকু উষ্মা জমেছিল, তা ক্রমশ উবে গেল। যতদূর সামনে নজর ফেলছি ততদূর কেবল মানুষ। যেকোন গরগরে মিছিলের জনসংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশী। পদযাত্রী বাবুরা অনেকেই বিশ্বরাজনীতির পিণ্ডি চটকাচ্ছে। স্বদেশ-চিন্তাও বাদ যাচ্ছে না। সব বিষয়েরই

আজব আজব মূল্যায়ণও হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, এমনি কিছুদিন যদি শিয়ালদা ডালহৌসী পদযাত্রা করতে হয় এবং তাতে যদি বিপ্লব-টিপ্লব গোছের কিছু একটা কাঙ্ক্ষিত জিনিস লাভ হয়, তবে সে কষ্ট স্বীকার করতে তারা খুব গররাজী নন। আমার অবশ্য এসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ভাবনা চিন্তা নিতান্তই কম। ঠিক মাথায় আসে না। অবশ্য এখন এই জনস্রোতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে মনে হল, না আমাকেও যেন কিছু নতুন করে ভাবতে হয়, নতুন কিছু, কিছু নতুন, যা আমি এতদিন ভাবিনি। তবুও এমন হিজিবিজি চিন্তাগুলিকে, খেয়াড়া মশাকে যেমন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয় তেমনি, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলাম। আমি নির্বিকল্প ঋষিপুরুষের মতো জনারণ্যের মধ্যদিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে ইন্টারভিউ ধরার জন্য ছুট দিলাম। কেননা একটা চাকরি আমার জরুরি দরকার। বেকার ভাতা খাতায় পেট ভরবে না।

আমার এই ইন্টারভিউ পাওয়ার পেছনে ছোট্ট একটু কাহিনী আছে। যার জন্য সত্যিত প্রয়োজন উপকাহিনীটুকুরও আতাষণ। বস্তুত সতীর সঙ্গে আমার অমন আকস্মিক দেখাটা যদি না ঘটত তবে এ ইন্টারভিউ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সতী আর আমি এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চারও হয়েছিল সে সময়েই। তা স্থায়ীও হয়েছিল দীর্ঘ দু-বৎসর ব্যাপি। দিনগুলি একটা নেশার মধ্যদিয়ে কেটে গিয়েছিল। কতো বড় স্বপ্ন ছিল তখন। আমরা দুজনে কি হাউসে এখানে ওখানে কতো বক-বকম করেছি। না, চুমু টুমু খাইনি একবারও। একবার আবেগে শুধু হাত চেপে ধরেছিলাম। সতী হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন হাসি হেসেছিল যে, আমি সে হাসি কোন দিন ভুলিনি। পরীক্ষার পর দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। প্রথম প্রথম ভীষণ বেদনাবোধ করতাম। মনে মনে সমগ্র নারী সমাজকে হৃদয়হীনা বলে অভিসম্পাত করতাম। বেদনাটা ক্রমশ ফিকে হয়ে গেল। বুঝলাম, এমনটাই হয়। কিন্তু আমার বুকের গুমের মধ্যে ভালবাসা জমেছিল অনেককাল। আমি তাকে ঐশ্বর্যের মতো লালন করেছি। হঠাৎ সেদিন সতীকে দেখে বুকের মধ্যে তুফান উঠল। কিন্তু সতীকে দেখেও না দেখার ভান করলাম। শৈশবে আমার মায়ের ওপর মাঝে মাঝে অভিমান হতো, মা তা বুঝতেন। সামান্য স্নেহের উত্তাপে সে অভিমান অশ্রুধারায় বিগলিত হত। শৈশবের অবুঝ অভিমানের মতো আমার চোখ দু'টো ছলছলে হয়ে গেল। সতী যদি তখন সামান্য সমবেদনা দেখিয়েও

বলত—তোমার কি হয়েছে ? আমি পোষা কুকুরের মতো ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে পারতাম। সতী আমার কাছে এসে বলল—ওমা, চিনতেই পারছিলাম না যে। সতী আগেকার চেয়ে কতো পালটে গেছে। ওর ডান চোখের তলায় একটা তিল ছিল, আমি তা খুঁজে পেলাম না। বস্তুত এখন সে পোষাকে প্রসাধনে ভীষণ আধুনিকা হয়ে গেছে। ও আঁচ পাওয়া দুধের মতো উছলে উঠেছে। সতীকে এখন আমার আর নিজের প্রেমিকা মনে হলো না, হাত ফসকে যাওয়া লোভের জিনিস মনে হলো। এখন অনুশোচনা হল, কেন আমি তখন সতীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করিনি। আমার নিজেকেও ঘৃণা করতে ইচ্ছে হল, আমার নিহত প্রেমের জন্য বুক চাপড়াতে ইচ্ছে করছিল।

সতীই আবার বলল – কি, ভীষণ গম্ভীর যে মশাই।

—না, নাতো, কোথায়। আমি সাফাই গাইতে চেষ্টা করলাম।

চোখ গোলগোল করে সতী বলল—কি করছ এখন ?

—কিস্‌সু না, একটা ছাত্রী আছে, সপ্তাহে তিন দিন পড়াই। ভেবেছিলাম ছাত্রীর উল্লেখে বুঝি সতী কৌতূহলী হবে। না, হল না। কেনই বা হবে!

আমি পালটা প্রশ্ন ছুঁড়লাম—তুমি কি করছ ?

—চাকরী !

—চাকরী ! আমি আশ্চর্য হলাম। কেননা সতীদের পরিবারের যা আর্থিক অবস্থা তাতে সতীর চাকরীর প্রয়োজন নেই।

—তোমার আবার চাকরীর দরকার হলো ? আমি বললাম।

—ভাইটা হিপি হয়ে গেছে, একটা আমেরিকান যুবতীর প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। বলছে টাকা মাটি, মাটি টাকা। আর আমি টাকা রোজগার করছি, প্রচুর টাকা, আরও প্রচুর টাকার আমার দরকার। আর ও প্রচুর।

সতী বেশ জোরে বেসুরে হাসি হাসল। আমার ভালো লাগল না। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা হরিণের ছবি আঁকা সোনার রংয়ের ছোট কলম বের করল। এক টুকরো কাগজে একটা ঠিকানা লিখে দিল। বলল, চাকরীর যদি প্রয়োজন থাকে তবে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ো। কিছু সেলস্ একস্‌পিরিয়েন্স্ড্ নেবে।

বৌবাজার আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসে দেখি, কারা লাল পতাকা উড়িয়ে পথ জুড়ে সভা করছে। চারদিকে ট্রাম জমে আছে। অনেক চাল-

লাঠি-ওয়ালা পুলিশ নিষ্কর্মার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। জায়গাটার আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে থমথমে। এমন থমথমে আবহাওয়ায় আমার ভয় ভয় করে। দ্রুত পদক্ষেপে মোড়টুকু পেরিয়ে গেলাম। তারপর আবার চিরন্তন কলকাতা. ছাদের ইটের ফাঁকে শিশু বটবৃক্ষ। একটা নির্বিকার কাক, কৌতূহলী হয়ে যেন জনস্রোত দেখছে। একটানা ট্রামের তার, তারমধ্যে কোন ছন্দ আছে কি না জানি না।

পথ চলতে চলতে আমার আবার সতীর কথা মনে হ'ল। বস্তুত আজ কয়দিন সতী আমার বুকের মধ্যে শ্বাস-কষ্টের মতো অবিরাম আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পুরনো সতীকে আর আমি খুঁজে পেলাম না। পুরনো কোন জিনিস বোধ হয় ফিরে পাওয়া যায় না। সতী আরও প্রচুর অর্থ চায়। কি করবে সতী এত টাকা দিয়ে! ওদের অঢেল টাকা আছে। ওর ছোট ভাই মানসকে আমি দেখেছি। মানস নাকি এখন হিপি হয়ে গেছে। আমার এখন অনেক কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছিল। স্মৃতির মণিকোঠায় অনেকগুলি ছবি সাজান ছিল। আমার বাবা, বেলঘরিয়ার কলোনীতে মুলি বাঁশের বেড়া দেওয়া ঘরে তক্তপোষের উপর চোখ বুঁজে বসে থাকেন। পাশের ডোবায় ব্যাঙ ডাকে, কাঁঠালগাছের পাতার উপর লক্ষ লক্ষ মশা ওড়ে। বাবা বসে বসে মেঘনা-পদ্মার গর্জন শোনেন নিভৃতে। মায়ের অমল মুখ ম্রিয়মান হয়ে গেছে দারিদ্র্যের ঝলকানিতে। মায়ের মুখের দিকে তাকালে আমার কুলুঙ্গিতে রাখা লক্ষ্মীর পটের কথা মনে হয়। মায়ের কপালে সব সময় সিন্দুরের টীপ জ্বলে থাকে। আমার অতীশের কথা মনে হল, নির্মল, সন্দীপের কথাও মনে হল। অতীশের বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্যটাকে আমি এখনো ভুলিনি, ভুলতে পারিনি। বাকী জীবনও সম্ভবত ভুলতে পারব না। অতীশ আমার সহপাঠী ছিল। একসঙ্গে বি.এ. পাশ করেছিলাম। ও কলোনীর প্রাইমারী স্কুলের যিনি মাইনের মাষ্টার ছিল। এই ভরসায় যে, স্কুল সরকারী মনোনয়ন পেলে পাকাপাকি চাকরী পাবে। এর মধ্যে দেওয়ালে দেওয়ালে কৃষি বিপ্লবের স্লোগান লেখা হতে লাগল। শুনলাম, অতীশ এদলের নেতা। ভাগ্যক্রমে ওর সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল একদিন। কলোনীর ছেলেদের একটা ঘরোয়া সভা করে ফিরছিল। ভীষণ ব্যস্ত মনে হল। আমাকে হাতের কাছে পেয়েই আমার দু'কাঁধে হাত রাখল, বলল—এমন মড়ার মতো বেঁচে থাকবি কতোদিন? ওর দুচোখে আগুন জ্বলছিল। যেন আমায় সম্মোহিত করে ফেলেছিল। কে জানত, আমার

বুকের গহীনে একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আছে! আমি পালিয়ে এসেছিলাম। আর অতীশের সঙ্গে দেখা হয়নি। এরপরই বোম পাইপগানের লড়াই সুরু হয়ে গেল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম, অতীশ খুন হয়েছে। অতীশের মৃতদেহটা আমাদের ডোবার ওপারে জলে-কাদায় পড়ে ছিল। ওর গলার নলিটা কাটা ছিল, আর সব ঠিক আগেকার মতো। জামা কাপড় পরা যেন শুয়ে আছে। শুধু চোখ দুটো স্থির হয়ে ছিল। কি আশ্চর্য! লোকজন তেমন কেউ এলনা মৃতদেহটা দেখতে। ভুলক্রমে যাদের নজরে পড়েছিল, তারাও চোখ ফিরিয়ে পালিয়ে গেল। মা এসে ঘরের মধ্যেই চারদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে আমার কানের কাছে নিম্ন স্বরে বললেন—জানিস, নির্মলরা নাকি অতীশকে খুন করেছে। বিকেলে কলোনীর রাস্তায় পুলিশের বুটের শব্দ বাজল। দু'জন পুলিশ মৃতদেহের হাত পা ধরে ভ্যানে ছুঁড়ে দিল। পরদিন সকালে দেখলাম, সমস্ত দেওয়াল মোছা হয়ে গেছে। রাত্রে নতুন শ্লোগান লেখা হয়ে গেল। নতুন বিপ্লবের আবাহনী। নির্মল আমাদের বাড়ী এলো একদিন, বলল—আমাদের একটা ঘরোয়া মিটিং আছে, দাদা যাবেন। বিনীত নিমন্ত্রণের আড়ালেও যেন আদেশের শাণিত ছুরি ঝক্‌মক্ করছিল। আমি বিগলিত ভাবে বললাম—অবশ্যই যাবো। বলা বাহুল্য, সে সভায় যাইনি। নির্মল রাস্তার মোড়ে ধরল দুদিন বাদে—কি দাদা, মিটিংএ গেলেন না? আমি আমতা আমতা করে বললাম—বুঝলে, শরীরটা খারাপ ছিল। নির্মলের মুখ দেখে বুঝলাম, সে আমার কথা আদৌ বিশ্বাস করেনি। তারপর নির্মলরা উধাও হয়ে গেল। নির্মলকে সেদিন শিয়ালদায় দেখেছি। বিষণ্ণ মুখ। আমাকে দেখে যেন সরে গেল। সন্দীপরা রঙ্গমঞ্চে এলো। সন্দীপ আমার ছোট ভাই-এর চেয়েও ছোট। সন্দীপ বলল একদিন—দাদা, আমরা শান্তি এনেছি। দেখলাম, দেওয়ালে নতুন সমাজবাদের বাণী লেখা হয়েছে। তার সঙ্গে দু হাজার সাল পর্যন্ত দেওয়াল দখল রাখার পরোয়ানা আঁকা আছে। অর্থাৎ এই দেওয়াল ২০০০ সাল পর্যন্ত এদের দখলে থাকবে।

আমি বোধ হয় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অতীশ, নির্মল, সন্দীপদের কথা ভেবে। ওদের সঙ্গে আমার ভাগ্যও জড়িয়ে আছে নিঃসন্দেহে। তবুও আমি যে ওদের দলে ভিড়িনি তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই। বরং ভেবেছি, কি হবে এসব করে। আমার মতো সাধারণ মানুষদের মধ্যেও, ফুসফুসের মধ্যে যেমন শ্লেষ্মা জড়িয়ে থাকে, তেমনি দার্শনিকতা জড়িয়ে আছে।

তাই আমার সাত পাঁচ ভাবতে দারুণ ভালো লাগছে। কখন যে এতটা এগিয়ে গেছি খেয়াল নেই। দেখলাম, ডালহৌসীর গির্জাটার সামনে এসে পড়েছি। আশ্চর্য এর চুড়োর উপরে একটা মুরগীর মূর্তি রয়েছে। এর আগে লক্ষ্য করিনি। ব্রাবোর্ণ রোডের দিকে ঘুরলাম। দেখলাম শুধু জনতা, পায়ে হেঁটে এদিক ওদিক ইচ্ছামত চলছে। ট্রাফিক সিগনালের শাসানি নেই, নেই যানবাহন থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে চলার দায়। ট্যাকসি বা প্রাইভেট কার একটা দু'টো আসছে, অমনি সাধারণের হৈ হৈ এর মধ্যে থেমে যাচ্ছে।

সারাটা কলকাতা যখন অচল হয়ে আছে তখনো এই গলিটা ভীষণ প্রাণবন্ত প্রচণ্ড চেঁচামেচি, হাঁকাহাকি। একটা লোক একটা বাক্সোর মত জায়গায় বসে আছে, দু' কানে দুটো টেলিফোন নিয়ে। নীচের থেকে এক গাদা লোক উত্তেজনায় চিৎকার করছে। দৃশ্যটা দেখতে আমার ভারি মজা লাগে। শেয়ারের দামের অধোগতি, উর্দ্ধগতির টানাপোড়েনে ভারতবর্ষ বেঁচে আছে। আমার যেন মনে হলো কে যেন নিলাম হাঁকছে। নিলামে সারা পৃথিবী-কিনে নেবে। সামনে দেখলাম, একটা জাল ঘেরা পুলিসের গাড়ী, কারা চাকার হওয়া খুলে দিয়েছে। সে ভ্যানের মধ্যে বন্দীর মতো এক গাদা পুলিশ। শুধু পায়ের বুট-কেটি দেখা যাচ্ছে, জালের ফাঁকে।

কাঠের সিঁড়িতে সবুজ রংয়ের গালিচা পাতা ছিল। সে গালিচার উপরে পাদুকার চিহ্ন এঁকে এঁকে ওপরে উঠে গেলাম। দরজায় বিরাট পাগড়ি আঁটা দরোয়ান পাহারায় ছিল। আমাকে দেখে ঠেলে কাঁচের দরজা খুলে দিল। আমি কাঁচুমাচু ভাবে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। দরোয়ানটার কপালে চন্দনের টিপ ছিল। ঢুকে পড়ার পর একথা মনে হল। দরজার রঙিন কাঁচে নৃত্যরতা উর্বশীর ছবি আঁকা ছিল। সামনে ঢুকেই দেখলাম, যতদূর নজর পাওয়া যায় এমনি বড় হল ঘর। লোকজন, টাইপ রাইটার, টেলিফোনে ঠাসাঠাসি। একেবারে সম্মুখ ভাগে লম্বা সোফায় কয়েকজন যুবক বিমর্ষ মুখে বসেছিল। বুঝলাম, এরাও কর্মপ্রার্থী। নিশ্চিত হওয়ার জন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইণ্টারভিউ দিতে এসেছেন? ছেলেটা মুখে কিছুই বললনা, আমার মুখের দিকে তাকাল, গলায় ঝোলান টাইটাকে একটু নীচের দিকে টানল, একটু নড়েচড়ে বসল। ট্রেনে তিন জনের সীটে চতুর্থজন যেমন ঠেলে গুঁজে বসে আমি ও তেমনি সোফার একধারে জায়গা দখল করলাম। বসে আড়চোখে অন্য সব কর্মপ্রার্থীদের দেখছিলাম। অন্যরাও অমনি ভাবে দেখছিল। মাঝে

মাঝে চার চক্ষুর মিলনও হয়ে যাচ্ছিল, শুধু শিহরণ নেই। সবাই শান্ত ছেলের মতো বসে রইল। কোনো সাড়া শব্দ নেই। কলকাতার রাস্তায় বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, টেম্পো, ঠেলা-রিকশা সব বন্ধ। এমন একটা মুখরোচক বিষয়ের অবতারণা করল না কেউ ই—আমি আশ্চর্য হলাম। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ দেখলাম, দেয়ালের বেশ উঁচুতে একটা কাঁচের কেসে বন্দী গণপতিজী। সামনে সুবাসিত ধূপ জ্বলে মুহুর্মুহু ধোঁয়া উড়ছে। কর্মপ্রার্থীদের প্রত্যেকে উদখুস করছিল, আড়মোড়া ভাঙছিল, হাই তুলছিল, নড়ে চড়ে বসছিল। সর্বশেষে একজন মুখ খুলল।

—কখন ডাকচে দাদা ?

—কি জানি মশাই।

—আপনি কোত্থেকে এসেছেন ?

—বেলঘরিয়া।

—আপনি ?

—বেহালা।

—আপনি ?

একটু গর্বভরে বলল—বালিগান্জ।

একজন ফস করে বলে ফেলল—চাকরিটা আমার হয়েও যেতে পারে, একটা ব্যাকিং আছে কি না। অন্য একজন বলল—আপনার ব্যাকিং আছে বুঝি ? আমারও একটু আছে। তবে বিশ্বাস নেই মশায় আজকাল শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল, সকলের ব্যাকিং আছে। সুতরাং সকলেই হতাশ হলো। বলা বাহুল্য আমিও।

পাগড়ীওয়ালা হিন্দুস্থানী চাপরাশিটা বিচিত্রভাবে বিকৃত করে এক এক জনের নাম ডাকতে লাগল। আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। প্রায় সকলের নাম ডাকা হল, কিন্তু আমার নাম ডাকা হল না। আমি নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিলাম—প্রেমিকের মতো ধৈর্যশীল হও, পিপীলিকার মতো পরিশ্রমী হও।

দরজা ঠেলে আমি সুদৃশ্য চেম্বারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বিরাট ঘর, সব জানালা বন্ধ। বুঝলাম ঘরটা এয়ার কণ্ডিসানড্। ঘরজোড়া পুরু গালিচা, মেসিন দিয়ে ছাটা পুরু ঘাসের মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটলে যেমন লাগে, আমার

তেমন মনে হল। বিরাট লম্বা বাঁকানো কনফারেন্স টেবিলটার ওপাশে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। সুখী সুখী মুখ, বেশ হাসি খুশী মনে হল। সাধারণত চাকুরীপ্রার্থীদের কিছু আদব কায়দা রপ্ত রাখতে হয়। যেমন, শুভ মর্নিং—আফটারনুন করা, গড়গড়িয়ে ইংরেজী বলা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে ব্যতিক্রম দেখা গেল। ভদ্রলোক নিজে আমায় অভ্যর্থনা করলেন—আসুন, আসুন অমলেশ বাবু। অনেকগুলি চেয়ারের মধ্যে কোনটাতে আমি বসব স্থির করতে কিঞ্চিৎ সময় লাগল। অবশেষে মুখোমুখি বসলাম। দেখলাম, যে ধরণের পাগড়ি পরা চাপরাশি এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল, তেমনি একজন এসে সোনার রংয়ের বর্ডার দেওয়া একটা বিরাট কাপে চা এনে দিল। বুঝলাম, এটা আমারই জন্য। একটু ইতস্তত করে চা খেয়ে ফেললাম।

ভদ্রলোক বললেন—আপনার কথা মিস রায়চৌধুরী বলেছেন। ইউ নিড এ জব। আমারও একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার, ভেরি ফেথফুল। আমি একটু বিষম খেলাম। 'মিস রায়চৌধুরী' বলাতে প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিলাম, ও সতীর কথা বলছে। খুব সংযতভাবে বললাম —হাঁ, সতী আর আর আমি ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়েছি।

একপাশ থেকে একটা দরজা ঠেলে হঠাৎ সতী বেরিয়ে পড়ল। সতীর দিকে তাকিয়ে আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। সতীকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘন সবুজ রংয়ের শাড়ী, ব্লাউজ, টিপ লিপষ্টিক মিলিয়ে সতীকে দারুণ দেখাচ্ছিল। সতী দু' খানা চেয়ার দূরে আমার পাশে বসল। একেবারে আমার পাশে বসল না। বসতে ইচ্ছে করল না হয়তো।

মিঃ সেঠিয়া হাসলেন—অমলেশ বাবু, আপনি কোন সাবজেক্টে এম. এ.

—বাংলায়।

—আমার বাংলা শুনে কেমন মনে হয়?

—আপনি যে অবাঙালী বোঝা যায় না।

ভদ্রলোক একটু গ্যালগ্যালে হাসি হাসলেন, বললেন—আমার মেয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত করে—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। উই আর রিয়েলি প্রাউড্ অব টে-গো-র। আমি সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকুনি দিলাম।

—অমলেশবাবু, আপনি যা মাইনে চেয়েছেন, আই মিন ফোর ফিফটি'ই আপনাকে দেবো। তবে কাজ একটু কনফিডেন্সিয়াল ধরণের হবে।

আমি মনে মনে ভাবলাম—ব্যাটা বলে কি। আমার চোয়াল যেন দৃঢ়তায় শক্ত হয়ে উঠল, এতক্ষণ নেভিয়ে পড়েছিলাম, এখন সোজা হয়ে বললাম বললাম, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মিঃ শেঠিয়া মিহি হাসি হাসলেন—মানে আমাদের বিজনেসের কিছু সিক্রেট কাগজ পত্র রাখতে হয়। বুঝলেন, শালার গভর্ণমেণ্ট যা হয়েছে মশাই।

—আমি পারব না।

কথাটা বজ্রের মতো গিয়ে যেন বিঁধল ভদ্রলোককে। ওর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। সতী ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার কান দুটো গরম হয়ে গেল। বুকের ভিতর আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়তে চাইল। মিঃ শেঠিয়া মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন। মোলায়েম গলায় বললেন—আরো বেশী কিছু চাই? পাঁচশো টাকা। আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—না, আমি চাকরি করব না। ভদ্রলোক নেকড়ের মতো হাসলেন, নিলামে জিনিস ডাকার মতো হাঁকতে লাগলেন—কতো চাই, সেভেন হানড্রেড ওয়ান থাউজেণ্ড, হাউ মাচ্?…

আমি সজোরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। মিঃ শেঠিয়ার তাচ্ছিল্যের হাসি আমার সর্বাঙ্গে বিদ্ধ করছিল। সতী আমার হাত চেপে ধরল—তুমি পাগল হয়ে গেছ।

সত্যি আমি পাগল হয়ে গেছি। সতী আমাকে সে ভালোবাসায় স্বরে ডাকছে—অমল, তুমি পাগল হয়ে গেছ। ওর হাত ধরে আমার কান্না করতে ইচ্ছে করল। আমি দেখলাম, সতীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে সযত্নে পোষা একটা বিরাট নখ। নখটা দেখে আমার ঘেন্না লাগল। আমার বলতে ইচ্ছে করল, সতী, তুমি আমার প্রেমিকা ছিলে। এখন লোভের জিনিস হয়ে গেছ। নির্জন করিডোরে সতীকে একা ফেলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

অপরাহ্নের ঝুলে থাকা আলোটুকুও যে এত মধুর হয় আমার জানা ছিল না! আমার নিজেকে হালকা, মুক্ত মনে হল। ভীষণ খুশী মনে হল। জানি, অর্থ দিলে মিঃ শেঠিয়ার বিশ্বস্ত লোকের অভাব হবে না। আমার অতীশের কথা মনে হল, নির্মল সন্দীপের কথা মনে হল। বিপ্লবের কথা মনে হল, বিশ শ' সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন শান্তির শপথের কথা মনে হল। এমনি অনেক ভাবনা অনুরণিত হচ্ছিল।

যানবাহন মুক্ত রাজপথে ঘরে ফেরার লোকদের দেখলাম! আমার নিরানন্দ ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে এখন সূর্যের শেষ রশ্মিকণা গলা সোনার মতো ঢুকে পড়ছে। সেখানে তপ্তপোষের উপরে বৃদ্ধ পিতা মেঘনা-পদ্মার গর্জন শুনছেন আর আমার সর্বংসহা মাতা, যাঁর কপালে রক্ত সূর্য আঁকা, যিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সে ঘরে আমি কি আর ফিরতে পারব?

বীথি চলে গেছে

আমাদের চারবোনের নাম মালতী, যুথিকা, লতিকা ও বীথিকা। মা বলতেন, তোরা এক বোঁটায় ফোটা চারটে ফুল। আমাদের এক দূর সম্পর্কের জামাইবাবু ছিলেন, আগে আমাদের এখানে প্রায়ই আসতেন। লোকটা যেমনি হাসিখুশী তেমনি অসভ্যও। ইয়ার্কি করে বলতেন, তোমরা চারটে সমুদ্র, প্রেমের সমুদ্র। তখন প্রেম ট্রেম কিছু বুঝতাম না। দেখতাম, বড় দুই দিদি জিভ বের করে ভেংচাত, হাত মুঠোকরে কিল দেখাত। কিছু না বুঝেও আমার শরীর কেমন লজ্জায় আনন্দে শির শির করত। আমাদের এক ঠাকুরমা ছিলেন, বাবার পিসিমা। অল্প বয়সে সংসারের নোঙর ছিঁড়ে এ বস্তিতে এসে ওঠেন, এ বাড়িটাও তারই। তার সন্তানাদি ছিল না তাই বাবাকে পুষ্যি রেখেছিলেন। বুড়ি সারাদিন আমাদের সাথে খিটির মিটির করতেন। বলতেন, চারটে আপোদ জন্মেছে। আমাদের আটপৌরে নাম দিয়েছিলেন বড়দির নাম মিনি, মেজদির বিন্তি, আমার নাম লতি আর বীথির নাম বুঁড়ি। ঠাকুরমা মায়ের আগেই গত হয়েছেন, কিন্তু তার দেওয়া নামগুলো এখনো সগৌরবে বহাল আছে।

এতদিন আমরা চারবোন এক বোঁটায় ফোটা ফুলের মতই ফুটেছিলাম। কিন্তু একটি আজ চুপিসারে খসে পড়ল। কে জানত এমনি হবে। বড়দি-না, মেজদি-না, আমি-না, এমনকি বাবাও-না। বীথি আমাদের চারবোনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা, বয়স ষোল চলছিল, চৈত্রে সতেরতে পড়ত। আমার উনিশ, মেজদির তেইশ এবং বড়দির সম্ভবত পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। বীথি আর আমার বয়সের দু'বছর ব্যবধান হলেও আমাদের দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব ছিল। ওর গায়ের রং ছিল ফর্সা, আমাদের সকলের চেয়ে। বীথি আমায় দিদি ডাকত না, বলত —লতা লতে লতা। আমি একদিন ওর কানমুলে দিয়েছিলাম। ও আমার বিনুনি টেনে ধরেছিল। আমিও ওর গাল কামড়ে দিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে এমনি মারামারি ঝগড়া প্রায়ই হত। গত পাঁচদিন আমি ওর সঙ্গে কথা বলিনি। এখন মন কেমন করছে। কেমন ঠাণ্ডা লড়াই এর মতো গুমোট

ওমোট ভাব সত্বেও আমরা চারবোন এক অদৃশ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছিলাম, যা এতদিন বুঝতে পারিনি।

আজকের সকালটা কেমন যেন একটু অন্য রকমের, অন্য হাজারো দিনের মত নয়। বস্তুত আমাদের সংসারের দিনগুলি কেমন বৈচিত্র্যহীনভাবে একটানা গড়িয়ে চলে। শিরিষ গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য ওঠে, দিন হয়, বস্তির ওপার দিয়ে সূর্য ডোবে। এমনি বিগত দশ বছর অন্তত চলছে ছেদহীনভাবে সুখ-দুঃখের বহতা ধারা। মায়ের মরার পর আর একটা ঘটনাও ঘটেনি যা মনে গেঁথে থাকে। মেজদির চাকরি ছিল, চলে গেছে। সুধাদা আগে আসত, এখন আসে না। সুদামা সিং আগে আসত, এখন আসেনা। সে কিছু না, মনে কোন রেখাপাত করেনা। বড়দির জন্য একজন মাঝবয়সী পাত্র এসেছিল, বাবা রাজী ছিলেন, দিদিও। বিয়ে হলনা। সুদামা সিং মেজদির সাথে অনেক ঘুর ঘুর করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম বিয়ে হয়েই যায় বুঝি। তখন মেজদিরও কত দেমাক ; চাকরি চলে গেল। কে কোথায় ছিটকে চলে গেল। ওসব ওলট পালট।

আমি তক্তপোষের ওপরে বসে নীচের দিকে দেখছি। আমার মনে হচ্ছে যেন এগার তলা বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে দূরের পৃথিবী দেখছি। বড়দি আমার কয়েক হাত মাত্র দূরে পা ছড়িয়ে বসে আছে। মেজদিও কাছাকাছি বসে আছে। বাবা দাওয়ায় বসে আছেন। সব মিলিয়ে একটা শোকাবহ আবহাওয়া এবং এ পরিবেশে, এ অবস্থায়, যেমনি বসে থাকা প্রয়োজন, পাকা অভিনেত্রীর মত ঠিক সেভাবে বসে রইলাম।

সকাল থেকে বাবা ঠায় বসে আছেন। আমাদের দেড়কালি ঘর, এক কুঠরির অন্দরমহল এবং আধকালি বহির্মহল। বাবা থাকেন ও শোন ওই বারান্দাটুকুতে, মা মরার পর থেকে। একটানা এগার বছর। বাবা এখন ভেতরের ঘরে ঢোকেন না পারতপক্ষে। শুধু দিনে দু'বার ওঘর মাড়িয়ে রান্না ঘরে যান। ব্যস। বাবা সম্ভবত এমনিভাবে মায়ের শোক পালন করছেন। মা যখন মারা যান আমার বয়স তখন মাত্র আট আর বীথির ছয়। আমি আর বীথি একে অন্যকে জড়িয়ে দারুণ কান্না করেছিলাম। কিন্তু মায়ের চেহারাটাও এখন সঠিক স্মরণ নেই। দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা প্রায় অস্পষ্ট ছবিটার সাথে কল্পনার রং মিলিয়ে একটা ছবি তৈরী হয়। মনে হয়, মায়ের চোখের সরল চাহনিতে এক স্বর্গীয় পবিত্রতা মাখামাখি ছিল।

বাবা নিঃশব্দে বসে রয়েছেন, জড় পাথরের মত। অন্যদিন ঘন ঘন কাশি দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দেন। আজকে একটু কাশছেনও না। আশ্চর্য! বাবাকে অনেকদিন আমি হাসতে দেখিনি। হাঁ, অনেক দিনের আগেকার কথা এখন আবছা মনে পড়ছে। দিদিদের রাত্রির খাওয়া হয়ে গেলে বাবা একলা গিয়ে আমাদের খুপরি রান্নাঘরে খেতে বসতেন। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন বেচাল হাসি হাসতেন। মায়ের নিরক্ত মুখ উজ্জ্বলতায় চক্‌চক্ করত। সেসব তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি। বাবা এখন আর তেমন হাসেন না। কথাও বলেন পয়সা কড়ির মতো গুনে গুনে। হাসি যেন মণিমানিক্য আরও গহিনে যত্ন করে জমান। বাবা কাঁদতে পারেন কি? মা মরার পর কান্না করেছিলেন কি? কি জানি, মনে পড়েনা। বাবা কি বীথির জন্য কাঁদবেন? বীথিকে বেশী ভালবাসতেন? আমাদের কাউকে ভালবাসেন? জানিনা। মনে হয় বাবা কাউকেও ভালবাসেন না। এমনকি নিজেকেও না। বস্তুত বাবা যেন আমাদের সংসারের একজন দর্শক। আর আমাদের চার বোনের সংসার। আমরাই সংসারের সব। রেশন বাজার আমরাই করি। বাবা শুধু গুনে গুনে টাকাটা দেন। সংসারের মধ্যেও বড়দি কেমন যেন স্বতন্ত্র, মেজদি কখনো আমার সঙ্গে কখনো বড়দির সঙ্গে মিলেমিশে চলে। বাবা আমাদের শাসন করেন না, কোন কাজে বাধাও দেননা। তবু বাবাকে আমরা ভয় করি। বাবা বাড়ি থাকলে আমাদের পুরুষ বন্ধুরা এদিকের ছাড়া মাড়ায় না। আমাদের কোন বোনেরই তেমন কোন মেয়ে বন্ধু নেই। বরং মেয়েরা আমাদের নিন্দা করে সর্বক্ষণ, এসব আমরা জানি।

বড়দি বসে আছে শোবার ঘর আর রান্নাঘরের সীমান্তে। অর্থাৎ শোবার ঘরে বসে রান্নাঘরের চালু দিকে পা ছড়িয়ে দিয়েছে। বড়দিকে ভীষণ বিধ্বস্ত এবং বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। ওকে অনেকদিন আমি এমনি অখণ্ড মনযোগ দিয়ে দেখিনি। ওর গালের হাড়দুটো কেমন যেন বিশ্রীভাবে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়েছে। সারা মুখে বয়স বাড়ার ছাপ। মেজদি শোবার ঘরের মাঝখানে খালি মেঝেয় বসে আছে। ওর ঝুলো বিনুনিটা সারা রাতের ধস্তাধস্তিতে বিধ্বস্ত। এখন আমার মেজদির বন্ধু সুধাময় সিং এর কথা মনে পড়ে গেল। কিছু অসভ্য কথা বুকের ভিতরে গোপনে ডানা ঝাপটাতে লাগল। এ বাড়ির চারজন মানুষ আমরা চার জায়গায় বসে আছি। অন্যদিন এ সময়ে আমরা কেউ এখানে বসে থাকিনা। উনুনে আঁচ পড়ে, বড়দির রুটি বেলার আওয়াজ

হয়। এখন আয়নায় মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। রাত্রের ঘুমের পর আমার মুখেও কালসিটে মতো দাগ পড়েছে। আমরা কোন বোনই দেখতে সুন্দরী নই, বরং কুচ্ছিত বলা যেতে পারে। এর মধ্যে বীথির গায়ের রং ছিল ফর্সা, চোখের মণি কটা কটা। আমি ওকে ঠাট্টা করে বলতাম—ভগবানের কারখানা থেকে তোকে আধ সেঁকা করে ছেড়েছে। বীথি আমায় মুখ ভেংচাত, হাসত—দেখিস, এটাই আমার রূপের চাবিকাঠি। বলতাম—ছাই।

পাড়ার মধ্যে আমাদের বাড়িটার বদনাম আছে। আমরা চারবোন সে বদনামের কেন্দ্রমণি। আমরা সবাই খারাপ, অবশ্য যতটা খারাপ, গালগল্প তার চেয়ে ঢের বেশি। আমাদের বাড়ির সামনে কর্পোরেশনের কল, কলের উলটো দিকে অনাদি কাকার চায়ের দোকান। সে দোকানে সকাল থেকে ছেলেরা মাছির মত ভনভন করে। আমাদের দেখে, শিস দেয়। একজন আর একজনকে বলে—এই এটা তোর বৌ। তখন আমার বুকের মধ্যে একটা অনাস্বাদিত সুখ বেদনা হয়ে টলমল করে। আমরা তিন বোন দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সূর্য দেখি, আকাশ দেখি, চলমান জনস্রোত দেখি। বড়দিও কখন সখনো ক্ষণেকের জন্য এসে দাঁড়ায়। আবার অন্দরমহলে গিয়ে জোরে জোরে উনুনে হাওয়া দেয়, আঁচ বাড়ায়; এবং কোল থেকে তুলে সজনে ডাটা চিবোয়। আমি কল্পনা করি ছেলেরা সব এসে গেছে, সে পরিচিত মুখগুলো। আজ থেকে বীথি আর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সূর্য দেখবে না। কলতলায় জলের জন্য লাইন দেবে না। একটা ছেলে হয়ত আর একটাকে কথা বলবে—অ্যাই শুন তোমার বউকে ত দেখছি না। পাড়ার পরনিন্দা পরায়ণ হিতৈষীরা বলবে—তাইতো, বীথিকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বৌয়েরা যারা কখনো কথা বলে না, তারাও শুধাবে—এই বুঁতি কৈরে, ওর অসুখ করেনি ত! মুখ টিপে টিপে হাসবে। হাসুক গে। আজ থেকে বীথি আর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সূর্য দেখবে না।

সূর্য এখন অনেকদূর উঠে গিয়েছে, অনেকটা উপরে। আমাদের একটা টেবিল ঘড়ি আছে, সেটা কখনো ঠিক সময় দেয় না। ঘড়ির প্লেটের মধ্যে একটা পাখির ছবি আছে; পাখির ছবিটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। ঘড়িটা নিশ্চয়, কোন রাত্রের অথবা দিনের বারোটা থেকে। অর্থাৎ ঘড়িটার বারোটা বেজে গেছে। আমাদেরও। এখন কয়টা বাজে কি জানি। ন'টার কম নয়, হয়তো বা বেশী। আমার পেটের মধ্যে খিদে উথাল পাথাল করছে।

বস্তুত এখন আমার ক্ষুধা বোধ হওয়া উচিত নয়। কেননা বীথি আজ সকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আমি কখনো কিছুতেই খিদে ভুলে যেতে পারি না। বাবা অথবা দিদিদের কারোই খিদে পাচ্ছে না সম্ভবত। তবুও জমাট বাঁধা শোকাবহ আবহাওয়াটা গলিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বাবা দু' হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে বসে আছেন। দিদিদেরও নট নড়ন চড়ন। অথচ এখন বাবার ঝালাই এর দোকানে আগুন, আমাদের উনুনের আগুন পুরোদমে জ্বলা উচিত। যেহেতু পৃথিবীটা অনেকক্ষণ আগে জেগে উঠেছে, বিশ্বসংসারে এখন প্রাণ স্পন্দনে জমজমাট। আর আমরা চারজন মানুষ স্থবিরের মত বসে আছি।

খিদের প্রকোপ যতো বাড়তে লাগল বীথির ওপরে আমার বিরক্তিও বাড়ল। বাবা শেষ পর্যন্ত উঠলেন, ফতুয়া গায়ে দিলেন, চলে গেলেন। বড়দি উঠল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মেজদি উঠল, একটা প্লাষ্টিকের বালতি নিয়ে কলে লাইন দিতে গেল। আমি আয়নাটা টেনে নিয়ে নিজের মুখ দেখতে লাগলাম। গলির মধ্যে কিত্ কিত্ খেলতে খেলতে হঠাৎ একদিন ফ্রক ছাপিয়ে আমার যৌবন এসে গেল। আচমকা সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার মতো। এখন আয়নায় নিজের মুখ দেখতে আমার ভালো লাগে।

আজকের সকালের টিফিনটা বাতিল হয়ে গেছে। এটাই সম্ভবত বীথি চলে যাওয়ার একমাত্র লাভ। রোজ সকাল সাতটায় কলাই এর গেলাসে চা আর দু'খানা রুটি জোটে। রুটির সঙ্গে কখনো তেলি গুড় অথবা কুমড়োর তরকারি। বাবার ওপরের পাটির দাঁত পড়ে গেছে অনেকগুলো। বাবা কলাই এর গেলাসের চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে রুটি খান। মাড়ির সঙ্গে রুটি জুড়ে ছপ্‌ছপ্ আওয়াজ হয়। তখন আমার আর রুটি খেতে ইচ্ছে করে না। সকালে বিকালে রাত্রে রুটি, দুপুরে ভাত। আমাদের ছিল সংসারের পাঁচজন লোক, এখন চার। রেশন কার্ড ছয়। অর্থাৎ মা এখনো রেশন কার্ডে বেঁচে আছেন। মরা মায়ের রেশন খেয়েও আমাদের সপ্তাহ চলে না। এবার বীথির রেশনটাও পাওয়া যাবে। সব হলে কখনো রাত্রেও ভাত খাওয়া যাবে।

'বাবা, আমি মাণিকদার সঙ্গে চললুম, আমায় খোঁজ করো না।' বয়ে গেছে খোঁজ করার জন্য। ঘেন্নায় আমার সমস্ত শরীর রি রি করে উঠল। বীথি এমন একটা লোকের সঙ্গে পালিয়ে গেল! আবার কাব্যি করে চিঠি লেখা হয়েছে! আমরা বোনেরা কেউই খুব লেখাপড়া জানি না। মেজদি

একবার প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছিল। সে অবশ্য সুদামা সিং এর পয়সায়। তখন মেজদির কি দেমাক। আমার বীথির কথা মনে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত ও মাণিকের সঙ্গে পালিয়ে গেল। মাণিক গদাধর মণ্ডলের গ্যারেজে কাজ করত। লরির তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকত সারাদিন। সন্ধ্যায় দিশি মদ খেয়ে টলমল পায়ে চলত, জড়ান স্বরে গানও করত। বীথি ওর গান শুনে হাতে তালি বাজিয়ে আমোদ করত, হাসত। লোকটার বৌ ছেলেও নাকি আছে কোথায় কোন গ্রামদেশে।

আমাদের গলিতে বিকেল তার বিরাট ছায়া ফেলেছে। আজ দুপুরে খাওয়া হতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সাধারণতঃ এমনটা হয় না। আমি দু একবার গড়াগড়ি খেয়ে উঠে পড়েছি। অন্যদিন দুপুরে পরিপাটি ঘুম হয়, তাই আজ হাই তুলছি। বিকেলের ছায়াটা দৈত্যের মত বিরাট হয়ে গেছে। এসময়ে আমাদের বোনেদের সাজগোজ হয়ে যায়। বড়দিও বিনুনি করে, সাদা ভয়েলের ব্লাউজটা আর ফিকে আকাশী রংয়ের ছাপা শাড়িটা পরে। বস্তুত বড়দিকে তখন কিকিং সঙ্গীন মনে হয়। বিবর্ণ দুর্বাঘাসে বর্ষা পড়লে যেমন হয় তেমনি। আজ বড়দি ঘরের ভিতরে বসে কি যেন খুটখাট করছে। মেজদি বিছানায় শুয়ে বুকের ওপরে সিনেমা পত্রিকা চাপিয়ে রেখেছে। দুপুরের স্বল্প-বিরতির পর অনাদি কাকার দোকানের ভিড় আবার জমে উঠছে। কর্পোরেশনের কলে এখনো জল আসেনি, অথচ ড্রামগুলি কখন থেকে সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে।

একটা ট্যাক্সির আওয়াজ হল, অল্প পরিসর গলিটার মধ্য দিয়ে গাড়িটা খুব ধীরে এগিয়ে আসছে। সামনের কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, বিনুদি। আমাদের বস্তির ওপারে ওদের পাকা বাড়ি। বিনুদির সাথে বড়দির এককালে ভাব ছিল। ট্যাকসির দরজা খুলতেই একটা ডানপিটে ছেলে লাফিয়ে নামল। বিনুদির ছেলে। পেছনে একজন সুপুরুষ লোক। বিনুদির বর। বিনুদি ত ভরা জোয়ারের নদীর মতো ভরে উঠেছে। কপালে বিরাট টিপ সিঁদুরের অথবা কুমকুমের। সিঁথিতে সিঁদুরের মোটা আঁচড়, হাতে কয়েক গাছি চুড়ি, খালি সোনার সরুবত, ভারি কাঁকন, মাঝখানটায় শাঁখা, সব মিলিয়ে কেমন দেবী দেবী ভাব। বিনুদির এ সন্তানটা বিয়ের আগে পেটে এসেছিল, সে-নিয়ে পাড়াময় কানাকানি। আর এখন! অথচ বড়দির অবৈধ শিশুটা…।

এখন বেঁচে থাকলে এমনি বড় হতো, ডানপিটে হত, ফুটফুটে হত। ট্যাকসির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হল। বড়দি জিজ্ঞেস করল—কে রে ?—বিনুদি ! বড়দি জানলার ফাঁক দিয়ে একবার তাকাল, আবার রেশনের চাল থেকে কাঁকর বাছার কাজে মন দিল। মেজদি খোলা সিনেমা পত্রিকাটাকে তক্তপোষের ওপর উপুড় করে দিয়ে আমার পাশে দরজায় এসে দাঁড়াল। আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। আজ নির্মাই এর সাথে সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল, যাব না। নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বীথিটা শেষ পর্যন্ত এমন একটা কাণ্ড ঘটাল। কতদিন আমাদের পাড়ায় মাথা নিচু করে থাকতে হবে। আমার চোখে জল এসে গেল।

বাবা ভীষণ কাশছেন। একটানা। কাশতে কাশতে বাবা অনেক সময় ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যান। বাবার অন্য কোন অসুখ নেই। অন্তত আমি জন্মাবধি দেখিনি। এমন কি মরসুমী ফ্লু পর্যন্ত বাবাকে ঘায়েল করতে পারে না। বাবা দিব্যি কালাই এর দোকানে যান, ঘরে আসেন, খান ঘুমান—এমনি দিন চলছে। অথচ এই কাশিটা কিছুতেই সারে না। কাশির শব্দে আমার বিরক্ত লাগছে। ঘুম আসছে না, নানান হিজিবিজি ভাবনা হচ্ছে। সুধাদার কথা মনে হচ্ছে, সুধাদা সিং এর কথা মনে হচ্ছে, মাণিকের কথা মনে হচ্ছে। বড়দির জন্য আমার দুঃখ হল ; যদি সে মাঝবয়সী লোকটা সিল্কের পাঞ্জাবী পরে এসে বড়দিকে বিয়ে করে নিয়ে যেত। সুধাদা বড়দির সর্বনাশ করেছে। মেজদি সর্বনাশী আবার ওদিকেই ঝুঁকেছে। সুধাদার ছেলেকে কোল থেকে নিয়ে খুব চুমু খাচ্ছে আজকাল। এখন বীথি কি করছে। ভাববার চেষ্টা করলাম।

বাবার কাশির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ নাক ডাকার শব্দ নেই। বাবা কি মারা গেলেন। যা, যতোসব অলক্ষুণে কথা। থানার পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। আমার একবার উঠে বাবাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল, ঠিকমত শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা। আমি বুঝতে পারছি, বড়দি মেজদি কেউ ঘুমোয় নি। মটকা মেরে পড়ে আছে। আমরা মেঝেয় মাদুর পেতে তিনজন শুয়ে আছি। অন্যদিন চার বোন শুতাম। আজ একজন কমে গেছে। আমার বড়দিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল। বড়দির মুখে আজকাল কেমন

যেন একটা মায়ের ছাপ পড়েছে। মেজদি মাঝখানে শুয়ে রয়েছে। আমি বড়দিকে ছুঁতে পারলাম না।

দরজার ছিটকিনি খোলার মৃদু আওয়াজ হল। সন্তর্পণে পদ চালনার আওয়াজও হল। আমি চোখ খুলে দেখলাম, একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে গেল। মনে হল বড়দি উঠে গেছে। কেননা আমি মেজদিকে পাশে পেলাম। খুব কৌতূহল হল আমার। খানিকক্ষণ বাদে মেঝেতে আবার পদশব্দ বাজল। হাত বাড়িয়ে দেখলাম মেজদিও নেই।

আমাদের উঠোনের আর কতটা পরিসর হবে। সামান্য একফালি জায়গা। দশ পনের হাত লম্বায় হতে পারে। স্যাঁতসেতে মাটি প্রায় অস্পর্শ্য। কয়লা, ছাই রকমারী আবর্জনা। সে মাটিতে একটা চাঁপা গাছ জন্মেছে। ডাঙা হয়েছে বেশ, গভর নেই। এখনো একটা ফুলও ফোটেনি। গাছটাকে নিয়ে বড়দি মেজদির প্রায়ই ঝগড়া বাধে। ওরা উভয়েই দাবী করে গাছটা লাগিয়েছে। বড়দি যখন মেজদির সাথে ঝগড়া করে তখন ওকে খুব ছেলেমানুষ মনে হয়। মনে হয়, এখনো যে কোন পুরুষকে ভালবাসা উজাড় করে দিতে পারে।

এখন চাঁপা গাছটার তলায় ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ, পাশে প্রসন্ন চাঁদ। দেওয়ালের ওপাশে খোলা নর্দমার মধ্য দিয়ে সর সর শব্দে ময়লা জল বয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ। আমিও পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়লাম। আচমকা বড়দি যেন কেঁদে ফেলল—'ভাল্লাগছে না-রে বিন্তি। বুঁতিটা অমনি চলে গেল।' মেজদি নিথর হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি ওদের মুখের দিকে তাকালাম। আকাশের মেঘের দিকে, চাঁদের দিকে তাকালাম। একসময় আবিষ্কার করলাম যে আমরা তিন বোনই বীথিকে এখন নিদারুণ ঈর্ষা করছি।

তিন পকেটমার ও বিলাসী

তিনজন নোঙর ছেঁড়া মানুষ একদলে এসে জুটেছে। জগবন্ধুর তিন কূলে কেউ নেই, অন্তত কেউ জানে না। ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলে—বসুমতী আমায় প্রসব করেছে। রাখালের মা আছে এখনও বেঁচে। রাখাল নিজে গল্প করে, ছোটবেলা দীর্ঘদিন সে মায়ের দুধ খেয়েছে, ছাগলের বাচ্চার মত ঝুলে ঝুলে। তাই দুধের দাঁতে পোকা ধরেছিল। এখন নিজেকে নিজে ছাগলের বাচ্চা বলে গালাগাল করে। বুড়ি মা কারখানার দেওয়ালে গোবর চাপড়ায় সকালবেলাটা, বিকেলে কাঁকুলিয়ার ঘোরে—ঘুটে নেবে গো। অর্থের খুব অনটন হলে মাঝে মাঝে ছেলের কাছে আসে—বাপ, তুই মোর বাপ হোস্। রাখাল রাগতস্বরে বলে—গেট আউট। মিছরিলালের বাবা মারা গিয়েছে ছোট বয়সে, তারপর মা পালিয়ে গেছে কার সঙ্গে, সেসব স্মরণে নেই নিজের। দাদির কাছে মানুষ হয়েছে, সে বুড়ি মরার পর ঝাড়া হাত পা। মিছরিলাল দুঃখ করে বলে—তামাম দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। জগবন্ধু ও রাখাল দুজনেই ওকে গালাগাল করে—তুমি শালা একটা মাকড়া। পুরুষ মানুষের আবার দুঃখু কিসের রা।

তিনজনেই বসে বসে ভাবছিল, সময়টা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে, একেবারে বলার মত নয়। লোকগুলো এখন দারুণ হিসেবী, এবং প্রচণ্ড হুঁসিয়ার হয়ে পড়েছে। চারদিকে অর্থের খুব মহার্ঘ। যদিও টেরিলিনের প্যান্ট আর বুশ শার্টের তলায় থলথলে ভুঁড়ি এবং রকমারি প্রিন্ট শাড়ি, সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নিম্নদেশে প্রায় দৃশ্যমান মাংসল সুস্বাস্থ্য তবুও চারদিকে অর্থের ভীষণ অনটন। জগবন্ধু কোতো বাবু-বিবিদের উদ্দেশে থুথু ছুঁড়ল খানিকটা। রাখাল একটা খিস্তি করে গায়ের ঝাল মেটাল। মিছরিলাল চুপচাপ রইল।

মিছরিলাল শেষে বলল—আসলে শালা আমাদের পয়লাওয়ালাদের কাছেই ধোঁয়ার সামর্থ্য নেই।

—ঠিক বলেছিস, সে রকম জামা কাপড় চাই।

—আরও অনেক কিছু চাই, মাইরি ওই বইটা দেখলাম, ধরমিন্দর যে রকম।

অনেক গবেষণার পর এটা মনে হল যে আপাতত বড়লোকের পকেটের কাছে যাওয়াও অসম্ভব হয়েছে। সুতরাং লক্ষ্মী গরীব মানুষেরা। দুটো পয়সার মুখ দেখুক। কিন্তু আজ দুদিন একটা পয়সা হাতে আসেনি। জগবন্ধু সকলের জানা কাহিনীটারই পুনরাবৃত্তি করল—বুঝলি লোকটাকে দেখেই বুঝেছিলাম শালা ক্লায়েন্ট আছে। কেমন থপথপে থপথপে চেহারা, জামায় চিতের দাগ পড়ে গেছে, লোকটা সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামের একেবারে পেছনের সীটে বসে ঝিমুচ্ছিল। আঙুল আমি ঠিক চালিয়ে দিয়েছিলাম, টাকাটা ছুঁয়েও ফেলেছিলাম। এমন সময়ে পালোয়ান গোছের একটা লোক আমার কলার চেপে ধরল এবং বিরাট ওজনের একটা ঘুসি ছুঁড়ল। জগবন্ধু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল, নইলে....। তারপর জানালা দিয়ে দেহটা গলিয়ে দিয়েছিল। ট্রাম যাত্রীদের পকেটমার ধরার তোড়জোড় এবং দাপাদাপির মধ্যে তিনজন অনায়াসে গা ঢাকা দিল। মাছের চারের মধ্যে ঢিল ছুঁড়ে দিলে যেমন সেদিন আর মাছ জোটে না তেমনি খিতান পরিবেশটা গুলিয়ে গেল। সারাদিনে আর জমল না।

এখানে আগে এমন বসতি ছিল না, ছিল না টালির চাল দেওয়া অবিন্যস্ত ঘরের এমন জটলা। রেল-লাইনের পাশে সংক্ষিপ্ত চিলতে জমি জুড়ে ছিল নাম জানা-না জানা আগাছায়-জঙ্গলে সমাকীর্ণ, কোথাও নাবান জমি, নালা, কচুরি-পানার সম্বৎসর সবুজ শোভা। এখন নরকের মত জমজমাট বসতি। ওরা তিন জন পরিত্যক্ত রেল স্লিপারের উপর বসে ছিল। এলো পাথাড়ি ভাবছিল। সামনে রেলেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দির বলতে ইট গাঁথা একটা কুঠরি ঘর, হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। সবাই জানে, শিব না ছাতু, এসব গদাধর বেটার ভড়কি, জায়গাটুকু দখলে রাখার অছিলামাত্র। ওরা সামনে দিশি মদের বোতলটা নিয়ে ভাবছিল। তিনটে চায়ের গেলাসে ঢেলে চুক চুক গলছিল। সঙ্গে এক এক জনের বরাদ্দ একটা করে আলুর চপ। কলার পাতায় রাখা ছিল। চোখের সামনে—প্রায় মজে আসা একটা ডোবা, একটা নারকেল গাছ, বার্দ্ধক্যের চাপে বাঁকা হয়ে গেছে। আকাশে গোলাকৃতি চাঁদ লক্ষ্যত পূর্ণিমা অথবা চতুর্দশীর। সামান্য মদ খেলেই রাখাল আবার মাতাল হয়ে যায়। আকাশে চারটে চাঁদ দেখে। ওদের পাশ দিয়ে হা হা শব্দে বাতাস, ধুলো উড়িয়ে একটা ট্রেন চলে গেল, মাটি কাঁপিয়ে। জগবন্ধু খেদে বলল—না, এভাবে আর বাঁচা যায় না। অথচ চাহিদা ওদের এমন কিছু নয়। কখনো

একটা দাঁত মারলে ফুর্তিতে কেটে যায় দু চারদিন। পবিত্র পাঞ্জাবী হোটেলে তড়কা-মাংস খায়, গিরীশ শার দোকানের কালীমার্কা টানে, গরগরে হিন্দি ছবি দেখে। তিনজন বিলাসীর ঘরে ঢোকে, মাতাল হয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে, বিলাসীর জামা কাপড় ছিঁড়ে দেয়, বিলাসী বিয়ে করা বৌয়ের মত দরজায় হাত পা ছড়িয়ে বসে কাঁদে। তখন মিছরিলালের মনটা ভীষণ নরম হয়ে যায়। পরদা হলে বিলাসীকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। রাখাল বলে—ও একটা রাণ্ডি, ওর আবার ভালবাসা, ছো। রাখালেরও একটা স্বপ্ন আছে। গদাধরের মেয়েটা চোখ বাঁকিয়ে খিলখিল হাসে। রাখাল ছুঁই ছুঁই করেও ছুঁতে পারে না। মেয়েটা যেন কানামাছি খেলছে। রাখাল দাঁতে দাঁত চেপে মুখ দিয়ে একটা পাশব শব্দ বের করে, বলে—শালিকে একবার ধরতে পারলে····। বশ অবস্থায় সামনের দিকে দু হাত বাড়ায়। জগবন্ধু ওদের দলের সেরা মানুষ। হাত সাফাইতে ওস্তাদ। ওরাও ওকে ওস্তাদই বলে। ও বস্তিতেই একটা মেয়ে মানুষ জুটিয়েছে। খগেনের বৌটা স্বামী মারা যাবার পর সারাক্ষণ হা হা শব্দ করে কাঁদত। ওই দজ্জাল মেয়েটাকে জগবন্ধু হাত করেছে। মেয়েটা সকাল বিকেল বাবুদের বাড়িতে থালা বাসন মাজে। দু'বেলা জগবন্ধুর ভাত রান্না করে। 'মিনসের মুখে আগুন বলে' গালাগাল করে, আবার রাত্রে হাতের হাজায় সরষের তেল মেখে জগবন্ধুর কাছে শোয়। মিছরিলাল বলে—ওস্তাদ তুমিই খাসা আছো।

বস্তুত ওরা কেউ ভালো নেই, একথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করে। মিছরিলাল ভাবতে পারে না, সুর করে গান ধরে। ওর গান গাইতে খুব ভালো লাগে। জগবন্ধু রাখাল এরাই কতোদিন বলেছে—এই বেটা, তোর গলাখান খুব ভালো রে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে মিছরিলাল। এ ছাড়া আর কী করার আছে। রাখাল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বলল—আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। ওরা রাখালের কথা শুনল, ভাবল। বলল, তাই করা যাবে।

২

মিছরিলাল একটা অতি প্রচলিত হিন্দি হিট্ গানের সুর নিজের হারমনিয়মে বাজাতে বাজাতে রেল ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। জগবন্ধু ও রাখাল অনেকটা দূরে এসে দাঁড়াল। ভাবখানা এমন যেন এরা একে অন্যকে

চেনেনা। যেন নিতান্তই পথচারী ও কর্মসন্ধানী মানুষ। মিছরিলাল ইঁট সিমেন্টে বাঁধান একটা বেঞ্চিতে বসল, প্যান্টের পকেট থেকে অনেক কষ্টে একটা লাল রং এর ছোট প্লাষ্টিকের চিরুনি বের করল। পরিপাটী করে চুল আঁচড়াল, মাথার চুলে হাত চেপে দিয়ে চুলে ঢেউ তুলল। এর মধ্যে ওকে ঘিরে লোকজন জড় হয়েছে অনেক। পথ চলতি জনতা, ভবঘুরে, এমনি আরও নানান ধরণের মানুষ। এক সময় মিছরিলাল হারমনিয়াম বাজাতে সুরু করে দিল। ওর সুরেলা কণ্ঠস্বর হাওয়ায় ভাসতে লাগল। ও প্রাণের সমস্ত মমতা উজাড় করে দিয়ে হিন্দি গান গাইছিল। একটা অল্পবয়সী ছেলে, বয়স এগার বারো হবে হয়ত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকলের কাছ থেকে পাঁচ-দশ পয়সা জোগাড় করে নিল। একজন লোক একটা টাকা দিল। মিছরিলাল লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল, সে রাখাল। রাখাল চোখে ইসারা করল, অর্থাৎ আর গান গাওয়ার প্রয়োজন নেই, কাজ হয়ে গেছে। মিছরিলালের তখন উঠতে ইচ্ছে করছিল না, ওর প্রাণভরে গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সম্মোহিত শ্রোতারা তখনও তাকে ঘিরে রয়েছে। মিছরিলাল আরও একটা গান গাইল, তারপর অনেকের অনুরোধ উপেক্ষা করে উঠে এলো। দুটো গান গেয়ে দু টাকার সামান্ত বেশি কিছু পয়সা সে পেয়েছিল। ওই অর্থটাই ওর যথেষ্ট মনে হচ্ছিল। ছোটবেলা থেকে নিজে কতো স্বপ্ন দেখেছে, সে বড়ো গায়ক হবে।

স্টেশন পেরিয়ে আসতেই জগবন্ধু খিস্তি দিল—কি রে শালা, তোকে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে পাঠিয়েছিলাম? রাখালের চোখেমুখে উল্লাস ফুটে উঠেছিল, বড় দাঁও মারা গেছে। ও মিছরিলালকে জড়িয়ে ধরে রাস্তার মধ্যেই একবার চুম্ খেয়ে নিল। বলল, মাইরি লোকটা তোর গানে একেবারে মশগুল হয়েছিল। জগবন্ধু বলল—খুব গরীব মানুষ মনে হল। রাখাল নির্বিকার ভাবে বলল—হোকগে। মিছরিলাল বলে ফেলল—মাইরি গরীব মানুষের পকেট কাটতে আমার খুব লাগে। জগবন্ধু গর্বভরে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল, বলল—জানিস, আমরা পকেটমারেরা হরিশ্চন্দ্রের মতো, নিজের ছেলেকে পোড়াবার জন্যই পয়সা দাবি করি। মিছরিলাল এসব পুরাণের কাহিনী জানেনা, তাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। পকেটমারার কাজটা ভালো লাগে না, বরং গান গেয়ে ভিক্ষে করাও ঢের ভালো মনে হয়।

দুটো দিন গড়গড়িয়ে চলে গেল। সুখের দিন। সুখের দিনগুলো এমনি দ্রুত চলে যায়, মিছরিলালের মনে হল। এ দুদিন কোন কাজ ছিল না।

খাও দাও ফুর্তি করো। সকাল থেকে একটানা আড্ডা, রাজা-উজির মারা দুপুরে খেয়ে নিয়েছিল বৃন্দা সিং এর পবিত্র হিন্দু হোটেলে। কম্পিটিশনে খাওয়া, আউর লা আও। বৃন্দা সিং চোখ মারে—আরে ইয়ার চালাও যিতনা মর্জি। রাখাল বিড়বিড় করে বৃন্দা সিংকে খিস্তি দেয়—তোমার ত শালা মজা, মিটার উঠছে। বিকেলে বেশি দামের টিকিট কেটে গরগরে হিন্দি সিনেমা দেখে। সিনেমা হল থেকে সটান মদের দোকানে। তিনজনে বসে খুব মৌজ করে মদ টানে। জগবন্ধু বলে—কাল রাজা আজ ফকির একেই বলে। অবশ্য আমরা কাল ফকির ছিলাম আজ বাদশা হয়েছি। জগবন্ধুর কথা জিবে জড়িয়ে যায়, বোঝা যায় জগবন্ধু মাতাল হচ্ছে। রাখাল বলে—গুরু তুমি মাতাল হচ্ছো। আরে মাতাল হবার জন্যই ত মদ খাওয়া, জগবন্ধু জবাব দেয়। মিছরিলাল ঢোক ঢোক মদ গিলে। গলার মধ্য দিয়ে মদগুলো জানান দিতে দিতে নীচে নেমে যায়। ওর খুব ভালো লাগে। ও চোখ মেলে চারদিকে তাকায়, পৃথিবীটা নতুন নতুন মনে হয়। বুঝতে পারে ওর নেশা হচ্ছে। হোকগে। নেশার ঘোরে ও যেন দেখতে পায়, একটা গ্রাম্য বৃদ্ধ বুক চাপড়ে চাপড়ে বলে কাঁদছে। জগবন্ধু দূর থেকে লোকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মজার হাসি হাসছে—হে হে হে হে হে। মিছরিলাল নিজের মাথার দুদিক দু হাত দিয়ে চেপে ধরল। শিরাগুলো যেন কেমন বেয়াড়া ভাবে দপদপ করছে। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে আলোর শিখা যেমন দপদপ করে।

জগবন্ধুর চোখ মুখের অবস্থা দেখে বোঝা গেল, ও এক্ষুনি কিছু একটা ঘটাবে। বেকার ঝুট ঝামেলা মিছরিলালের এক দম পছন্দ নয়। সেজন্য জগা রাখাল ওকে বলে ভীতু। রাখাল মাঝে মাঝে আবার ইংরেজী ভাষাও বলে—কাওয়ার্ড। মিছরিলাল নিজে নিজে ভাবে—কী জানি হয়তো হবেও বা।

যা ভেবেছিল তাই হলো। জগবন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে টেবিল থেকে গেলাস বোতল সব চারদিকে ছুঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিল। ও চেঁচাতে লাগল—শালা, হারামির পয়সা পেয়েছ। শুধু জল দিয়ে মদের পয়সা নেবে। ভেবেছ আমরা শালা মাতাল হয়ে গেছি। রাখালও ওর পাশে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো টানটান হয়ে দাঁড়াল। এমনি সময়ে মিছরিলালের ভূমিকা হয় ওদের থামান, কিন্তু আজ সে চুপচাপ বসে রইল। কিছুক্ষণ এমনি হৈ হল্লা হট্টগোলের মধ্যে ওড়িখানার আধা-মস্তান ম্যানেজার, ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারার বেয়ারাগুলো মিলে

ওদের তিনজনকে ঠেলে ঠেলে বের করে দিল। জগবন্ধু রাখাল বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ গালাগাল করল। মোয়াবি দেখাল।

বিলাসীদের পাড়ায় নামার রাস্তাটায় কয়েকখানা সিঁড়ি আছে। অর্থাৎ ফুটপাথ থেকে বেশ্যাপাড়ার গলিতে নামতে খান সাতেক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। ওদের তিনজনেরই পা টলমল করছিল। উপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকটাকে মিছরিলালের মনে হচ্ছিল, একটা গহ্বরের মতো। ওরা একে অন্যের কাঁধে ভর করে খুব ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল। নেমে তিন জনই একটু যেন হাঁফ ছাড়ল। যেন একটা ভীষণ কাজ হয়ে গেছে, এমনি ভাব করে রাখাল বলল—বাক ঠিক নেমে গেছি। তখন ঘড় ঘড় করে ট্রাম যাচ্ছিল। নেশা হলে মিছরিলালের ট্রামের আওয়াজ ভালো লাগে। গাড়ি ঘোড়া চলার আওয়াজকে একটানা ড্রাম বাজানর আওয়াজের মতো মনে হয়।

বেশ্যাপাড়াটা খুব বড়সড়ো নয়, মালের গুদাম, করাতকল, সন্ন্যাসীর আশ্রম, যৌন ব্যাধির আরোগ্যশালা এ সমস্তের সঙ্গে মিলেমিশে আছে। গুটি কয়েক মাত্র ঘর। এর মধ্যে আবার অনেকের ঘর সংসার স্বামী সন্তানও আছে। সন্ধ্যে হলে পিরিতের লোকও আসে। বিলাসী একদিন বলেছিল মিছরি-লালকে, ঘর সংসার পেলে ও এ ব্যবসা ছেড়ে দিত। মিছরিলাল যখন এ কথাটা ভাবছিল, তখনি ওর নাকের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পড়ল। ও মশাকে গালমন্দ করল। দেখল, জগবন্ধু রাখাল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। মিছরিলাল নিজে পিছিয়ে পড়েছে। লাইন ঘরের সামনের বাঁধান বসার জায়গায় বিলাসী এবং অন্য আরেকটা মেয়ে বসেছিল। বিলাসী পানের পিক ফেলতে গিয়ে মিছরিলালকে দেখে ফেলল। মিছরিলাল দেখল জগবন্ধু রাখাল আরও এগিয়ে যাচ্ছে। বলল—এই গুরু কোথা যাচ্ছ? জগবন্ধু বলল—আজ অন্য মাল দেখি। বিলাসী মিষ্টি সুর করে ডাকল—মিছরি বাবু। মিছরিলাল ওদের সঙ্গে যেতে পারল না। বিলাসীও বোধহয় জানে যে ওর উপর মিছরিলালের দুর্বলতা আছে। মিছরিলাল বিলাসীর কপালের টিপ দেখল, ম্যাটম্যাটে আলোতেও কেমন ঝিকমিক করছে। বিলাসী মোহিনীর মতো হাসল, বলল—কী দেখছিস। মিছরিলাল কিছু বলতে পারল না। বিলাসী ওর কোমরে হাত জড়িয়ে ওকে ঘরে নিয়ে গেল।

মিছরিলাল ঘরে ঢুকেই তক্তপোষে সটান শুয়ে পড়ল। বলল—বিলাসী

আজ আমার মন ভালো নেই। বিলাসী ওর গা ঘেঁসে শুয়ে বলল—আমি তোর মন ভালো করে দেবো।

দুটো দিন যেন সুখ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর শরীরটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছিল মিছরিলালের। রাখাল ওর আগেই উঠে পড়েছে। ওরা দুজন একঘরে থাকে। আবার বৃন্দা সিং-এর পবিত্র পাঞ্জাবী হিন্দু হোটেলে যেতে হয়। মিছরিলালের বিছানা থেকে উঠতেই ইচ্ছে করল না। অথচ আজ পকেট গড়ের মাঠ। দু এক বেলা হয়ত বাকিতে খাওয়া জুটতে পারে। তারপর? একটা অনিশ্চয়তা খড়্গের মতো মাথার উপর ঝুলে থাকে। ভালো লাগে না। এখন যদি শুয়ে শুয়ে এক কাপ চা পাওয়া যেত। ওর বিলাসীর কথা মনে হল। বিলাসী ওকে বলেছিল—আজ রাত্তির এখানেই থাক। রাখাল তাড়া দিল মিছরিলালকে—এই ওঠ। এরপরে আবার রেল ষ্টেশনে বসে গান গাইতে হবে। জগবন্ধু রাখাল হাত সাফাই-এর কাজ করবে। আবার পবিত্র পাঞ্জাবী হোটেল, মদের দোকান এবং বিলাসীর অথবা অন্য কোন মেয়ে মানুষের ঘর। একেবারে ছকে বাঁধা পরিক্রমা। গান গেয়ে লোককে মোহিত রাখবে আর এই সুযোগে জগবন্ধু বা রাখাল পকেট ফাঁক করে দেবে, এটা ভালো লাগে না মিছরিলালের। ভীষণ কাপুরুষ মনে হয় নিজেকে। একেবারে অমানুষ মনে হয় জগবন্ধু এবং রাখালকে। অথচ কিছুদিন আগেও মিছরিলাল স্বপ্ন দেখত, সে গান গেয়ে দুনিয়া মাতিয়ে দেবে। অবশ্য সে নিজেও জানত, এটা নিছক কল্পনাই, বাস্তবের সঙ্গে এর নেই কোন সামুজ্য। তবু এ অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হল মিছরিলালের। ওর শুয়ে থেকেও রক্ষা নেই। একটু পরেই আসবে জগবন্ধু। মিছরি লালকে বিদ্রূপ করবে, এমনকি টানা হ্যাচড়াও করতে পারে। শেষে তাতে কাজ না হলে চড়-চাপড় মারবেও। অথচ ওদের অবাধ্য হলে বাসস্থানটাও হাত ছাড়া হয়ে যাবে। হোকগে। মিছরিলাল নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করল। এবং রাখাল ঘরে নেই দেখে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৃন্দা সিং এর হোটেলে গিয়ে চা খাবার ইচ্ছে হল। গেল না। কারণ সেখানে রাখাল জগবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। ও খানিকক্ষণ এলোমেলো হাঁটল, এদিক ওদিক। রাস্তায় লোকজন দোকান পাট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, রাস্তায় বাঁদর খেলা দেখল। এমনিভাবে চলতে

চলতে ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়ে গেল। ওকে যেন ঘোরার নেশায় পেয়ে গিয়েছিল। এক সময় ও ক্লান্ত হল, ক্ষুধাবোধ হল। ওর পকেটে সামান্ত কিছু পয়সা ছিল। ও অনেক সময় দাঁড়িয়ে সে পয়সার হিসেব মেলাতে চাইল। পারল না, একটা সস্তার হোটেল খুঁজল, যেখানে এই মহার্ঘের বাজারেও কমদামে ভালরুটি পাওয়া যায়। অনেক খুঁজেও যখন সে রকম হোটেলের সন্ধান মিললনা তখন সে সামনে পাওয়া একটা পবিত্র ভোজনালয়ে ঢুকে পড়ল। দুটো চাপাটির অর্ডার দিল। ডাল চাপাটি পেল। সেগুলো খেয়ে পকেটে হাত পুরল, অন্যের অলক্ষ্যে পয়সা গুনল। পানি দো বলে—বয় ছোকরাকে ডাকল, আওর দো—এমনি করে চার গেলাস জল পর পর খাওয়ার পর ওর মনে হল পেটের বিরাট গহ্বরটা জলে ভরে উঠেছে। ও পয়সা কয়টাকে মুঠো করে ম্যাসেনাইট-এর তৈরী চকচকে কাউন্টারে সশব্দে রাখল। সামনে তাকিয়ে দেখল, কেষ্ট ঠাকুরের ছবির সুমুখে মিষ্টি গন্ধ ধূপ জলছে। ও বাঁ-হাতে একমুঠো মৌরী নিল, দোকানদার একবার ওকে দেখল। অমনি ও লাফিয়ে নীচে নেমে গেল। নীচে নামতে ওর পেটের মধ্যেকার জলগুলো নড়ে চড়ে উঠল। ওর ভারি মজা লাগল।

এর মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কলকাতায় ঠিক সন্ধ্যে নেই, দিন থেকে এক লাফে রাত্রি। সন্ধ্যা বলে আলাদা কিছু দুর্নিরীক্ষ। ওর নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ঘরে যাওয়া যাবে না সেখানে দরজা বন্ধ। রাখাল নির্ঘাৎ সেখানে নেই। থাকলেও লাভ নেই। আজ ওকে ঘরেই ঢুকতে দেবে না। ও সে ঘরে আর ঢুকতেও চায়না। অথচ সত্যি ওর কেমন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছিল। চোখ জ্বালা করছিল। ওর পকেটে আর একটা পয়সাও অবশিষ্ট ছিল না।

একসময় নিজের অজানিত ভাবেই মিছরিলাল যেন দেখল সে ট্রাম লাইনের পরে ফুটপাথ, তার পরে সাত খানা সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে পড়েছে। বিলাসীদের পাড়ায় এসে গেছে। কি আশ্চর্য। বিলাসী নেই। এমন সময়ে ওকে সামনে বসে থাকতে দেখা যায়। দিনের বেলাতেও ছুটছাট খদ্দেরের আশায়। মিছরিলাল হুড়মুড় করে গিয়ে ওর দরজায় ধাক্কা দিল। বিলাসী দরজা খুলে মিছরিলালকে দেখে আশ্চর্য হল। মিছরিলাল দেখল, ঘরের মেজেয় মাংসের হাড় ছড়ান, জগবন্ধু রাখাল মদ গিলছে। বিলাসী ভ্রু নাচিয়ে হাসল, কিগো নাগর তুমিও। পয়সা আছে? বিলাসী মিছরিলালকে জাপটে

ধরে ওর পকেটে হাত গলিয়ে দিল। মিছরিলাল কিছুই বুঝতে পারছিল না, বিলাসী কী ওর সঙ্গে পরিহাস করছে। ও বিলাসীর গায়ের মিষ্টি গন্ধ পেল। হঠাৎ জগবন্ধু উঠে এলো, ওর চোখমুখ কেমন থমথমে। মিছরিলাল যেন বিপদের ইঙ্গিত পেল। ও দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। পারল না। জগবন্ধুর ডান হাতের শক্ত মুষ্টি ওর নাকের উপর এসে পড়ল। অমনি ফুঁই ফুলের মতো রক্ত ঝরছিল। বিলাসী ওকে ছেড়ে দিতেই ও মাটিতে পড়ে গেল। জগবন্ধুকে জাপটে ধরে ঘরে নিয়ে গেল বিলাসী। দরজা বন্ধ করে দিল। মিছরিলাল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। শুনল, দরজার ওপারে বিলাসী ভীষণ হাসছে। মিছরিলাল দেওয়াল ধরে দাঁড়াল। ওর মাথার কোণে কোণে গানের সুর বাজছিল। সামনে এগিয়ে আর দেওয়াল খুঁজে পেল না ও। তবু এক অদৃশ্য দেওয়ালকে যেন ভর করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

জীবন যে রকম

দিন ওদের সুখেই কাটছিল। যদিও আর্থিক যোগান ছিল অপ্রতুল, যদিও ওভারটাইম না পেলে সে মাসে অত্যন্ত অনটন দেখা দিত, সাপ্তাহিক রেশন তোলার পর বাজারের বরাদ্দ প্রায়শ ছাটাই হয়ে যেত। কখনো কখনো বাজার বাতিলও হয়ে যেত। তখন ভাত আলু ভরসা। তবুও দিন বেশ ঝরঝরে কেটে যাচ্ছিল—সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় মাখামাখি করে। অনেক অপ্রতুলতা হাসিমুখে মেনে নিয়ে এক অনড় স্থিতাবস্থার স্বস্তিতে দিন কাটছিল তিনজন মানুষের—লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং তাদের শিশুসন্তান বুলার।

কিন্তু একদিন সকালে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কিংবা আচমকা দম আটকে আসার মতো বা এমনি হাজারো অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার মতো নারায়ণ এবং তাহার সহকর্মীরা সকালে কারখানায় গিয়ে দেখল, দরজায় তালা ঝুলছে। মনে হল প্রকাশ্য দিবালোকে অন্ধকার চতুর ভালুকের মত আলোর আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে; ওরা সকলে মিলে খানিকক্ষণ জটলা পাকাল এবং তারপর সে জটলা ধীরে ধীরে গলে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু একজন মানুষ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। যে যার ঘরে ফিরে গেল।

খবরটা শুনে লক্ষ্মী বসে পড়ল—কী হবে? নারায়ণ আশ্বাস দিল—আরে আজকাল লক-আউট কিচ্ছু না, ফ্লুর মত হচ্ছে আবার সেরে যাচ্ছে। বরং না হওয়াটাই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। লক্ষ্মীর মন মানল না। পাশের ঘরের বৌ এর সাথে ম্যাটিনিতে সিনেমায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা বাতিল হল। ভেবেছিল দু একদিনের মধ্যে ফিরিওয়ালার কাছ থেকে ধারে একটা ব্লাউজ কিনবে, সে ইচ্ছাও পরিত্যক্ত হল। দিবানিদ্রা অন্যদিনের মতো জমজমাট হল না, আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে বুকের মাঝখানটায় কেমন যেন দপ্ দপ্ করতে লাগল। লক্ষ্মী চোখ রগড়ে উঠে পড়ল, পুরাতন ব্লাউজের সেলাই খোলা বগলের অংশ নতুন করে সেলাই করে দারিদ্র্যকে সামাল দিতে চাইল।

ক্রমশ অলস দিন অবসর মধ্যাহ্ন দীর্ঘতর মনে হতে লাগল। ছিন্নি বস্তি, উন্মুক্ত আবর্জনা, মাছের আঁশ, আনাজের খোসা, মরা বিড়াল, কাকছানা—সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা দম আটকানো আবহাওয়া; তার থেকে একটা দুর্গন্ধ বাতাস দিনরাত হু হু করে বয়। নারায়ণ প্রথম প্রথম সাজগোজ করে ঠিক কারখানার সময়েই বের হত, কারখানার সামনের অবস্থান শিবিরে হাজিরি দিত। নেতাদের কাছে কারখানা খোলার সম্ভাবনা জানতে চাইত। নারায়ণ দেখল অবস্থান শিবিরে জমায়েত দিনের পর দিন হালকা হয়ে আসছে। নেতারা কোন আশার আলো দেখাতে পারছেন না। সরকার নির্বিকারে।

অনেক অবাঞ্ছিত সত্যের মতো বুঝল, কারো সাধ্য নেই যে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত কারখানার দরজাটা হঠাৎ চিচিং ফাক করে দেয়। ইউনিয়নের কৌটো নিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরল কয়েক দিন। তারপর একসময়ে কারখানার গেটে হাজরি দেওয়াও বন্ধ করে দিল।

লক্ষ্মী তাড়া দিত—যাওনা গো একবার কারখানায়, খবরটা নিয়ে এসো। নারায়ণ ঝিম মেরে বসে থাকত, আকাশপাতাল ভাবত, নানান বিকল্প কাজের পরিকল্পনা মাথায় উঁকিঝুঁকি মারত। একসময় স্ত্রীর তাড়ায় ঘর ছাড়ত। কারখানার দিকে যেতে ইচ্ছে করত না, তাই যেতনা। সেখানে গেলে ত্রিপলের তলায় গুটি তিন চার লোক দেখতে পেত, মাথা নিচু করে উপুড় হয়ে বসে আছে সর্বক্ষণ আর চা তৈরী করে খাচ্ছে। পাশে চায়ের ভাঁড়ের পাহাড় জমছে। এ দৃশ্য ভালো লাগত না, ভীষণ শোকাবহ মনে হত।

নারায়ণ ঘরে ফিরে বিকল্প কাজের ভাবনা স্ত্রীকে ব্যক্ত করত, কোন একটা ছোটখাটো স্বাধীন ব্যবসা—গামছা, গেঞ্জির দোকান, নিদেন পক্ষে ময়দানে চা বেচা। লক্ষ্মী অসহায়ের মত বলত—আমার কিছু মাথায় আসছে না, যা ভালো বোঝ কর। নারায়ণ রাত্রে স্বপ্নের মধ্যেও নতুন ব্যবসার ছবি দেখত।

যেহেতু নারায়ণের সংসারটা স্বাভাবিক সময়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা ধরে, সুতরাং প্রতিকূল আবহাওয়ায় টাল সামলান গেল না বেশীদিন। একসময়ে ওরা পুরোপুরি অনাহারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

এমনি এক ঘোরতর দুঃসময়ে বুলার দু-চোখের মণির কাছের দিকটা কেমন অস্বাভাবিক রকম ফুলে উঠল। প্রথমে ভেবেছিল হাওয়া লেগেছে কিংবা ধুলোবালি হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছে। তাই বরিক কম্প্রেস করল, বার বার ফুক করাল, অন্য ঘর থেকে চেয়ে এনে কোন চোখের মলম লাগাল ; কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না। লক্ষ্মী কান্নাকাটি করল, নারায়ণকে বলল—একটা কিছু কর, ছেলেটা যে অন্ধ হয়ে যায়। নারায়ণ আমতা আমতা করল—একটা কিছু করা দরকার। লক্ষ্মী ঝগড়া করল। অবশেষে একদিন সকালে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সারা সকাল অপেক্ষা করার পর দুপুরের কাছাকাছি সময়ে ওদের ডাক পড়ল। ডাক্তার বাবু গভীর মনোযোগে বুলার চোখ দেখলেন, বললেন—এতদিন কোথায় ছিলেন ? তারপর প্রেসক্রিপশন করে দিলেন, বাইরের থেকে ওষুধ কিনতে হবে। লক্ষ্মী বলতে যাচ্ছিল—ডাক্তারবাবু, এ ওষুধ কি হাসপাতালে পাওয়া যাবেনা ? কিন্তু ডাক্তারবাবু খাবার দাবার যে তালিকা দিলেন তাতে আর ও ভরসা করে সে কথা বলতে পারল না।

বিষণ্ণ দম্পতি ঘরে ফিরে গেল। নারায়ণ ভাবল যে ভাবেই হোক বুলার ওষুধ কিনতেই হবে। একদিন ওষুধের দোকানে গিয়ে ওষুধটা দেখল ও।

ছোট্ট পলিথিনের একটা টিউব, দাম আট টাকা। বলাবাহুল্য তখন তার পকেটে সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ছিল মাত্র। ও বলল—ওষুধটা পরে নেবো। সেলসম্যান বিরক্ত হল।

এদিকে গামছা গেঞ্জি ইত্যাদির স্বাধীন ব্যবসা করার আষাঢ়ে পরিকল্পনা গুলি স্বপ্নেও পরিত্যক্ত ; সুতরাং অতীত কিছু ছিল, ভবিষ্যৎ কিছু নেই। একটা কিছু স্বপ্নও না থাকলে লোক কি করে বেঁচে থাকে! অভাব অনটনে দাম্পত্য জীবনের গ্রন্থিটাও যেন শিথিল হয়ে গেছে। লক্ষ্মী মন খুলে কথা বলে না, হাসে না। অথচ একসময়ে লক্ষ্মীর হাসিমুখ না দেখলে ওর মন খুব খারাপ হয়ে যেত। এখন ওরা স্বামী স্ত্রী দুজনে ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেল। পাড়া প্রতিবেশী সবার কাছে হাত পাতা শেষ। আগে নারায়ণের বন্ধু বান্ধব ছিল, তাসের আড্ডা ছিল। এখন কিছু নেই ; সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়ায় লক্ষ্মী জানে না। জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছে করে না। কেননা লক্ষ্মী টের পেয়ে গেছে যে নারায়ণ আজকাল প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে। কারখানা খোলা সম্পর্কে নানান কাহিনী শোনায়, বলে—এই কারখানা খুলে গেল বলে।

নারায়ণের বয়স এমন কিছু নয়, ত্রিশ ছুঁই ছুঁই এবং লক্ষ্মী সবে বিশ পেরিয়েছে। সুতরাং জৈবিক কারণেই নারায়ণের আকর্ষণ ছিল লক্ষ্মীর দেহের উপর। সে আকর্ষণ ও আজকাল ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরিচিত ছিনতাই কারীর মত সে লক্ষ্মীর গহণাগুলো সব ছিনিয়ে নিয়েছে। এক জোড়া কানের দুল, ব্রোঞ্জে আর সোনায় মেশান চুড়ি আর নাকের নাক ছবি পর্যন্ত। এ নিয়ে ঝগড়াও হয়। নারায়ণ রাগত স্বরে বলে—সব আমি খেয়েছি? তোমার ছেলে খেয়েছে, তুমি খেয়েছ। তবুও লোভাতুর দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর দিকে তাকায় ; শীর্ণ হাতদুটোতে লাল প্লাষ্টিকের চুড়ি ছাড়া কিছু দেখতে পায়না। হতাশ হয়। লক্ষ্মীকে দেখতে আর ভালো লাগেনা। প্রায়-অন্ধ শিশুটা দেওয়াল ধরে ধরে হাঁটে আর কাঁদে।

সকাল থেকে তিনজন অভুক্ত ছিল। ছেলেটা ট্যা ট্যা করে কাঁদছে। শকুনেরা যেমনি মড়া মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করে তেমনি অভুক্ত মায়ের স্তন নিয়ে ছেলেটা কাড়াকাড়ি করছে। বিকেলে সন্ধ্যে হবার ঠিক আগে নারায়ণ বুলাকে জামা কাপড় পরাল এবং ওকে নিয়ে বের হল। লক্ষ্মী বলল ওকে নিয়ে আবার কোথা যাচ্ছ? নারায়ণ জবাব দিল না। লক্ষ্মী ভাবনায় পড় গেল। আজকাল আর নারায়ণকে ভরসা করতে পারে না লক্ষ্মী। এখন আর লোকটার মাথা ঠিক নেই।

বেশ রাত করে ফিরল নারায়ণ, সঙ্গে চাল ডাল। ঘুমন্ত ছেলেটা কাদার মত লেপ্টিয়ে পড়েছে কাঁধের উপরে। লক্ষ্মী সেই বিকাল থেকে ঘর-বার করছে। অত দুঃখের মধ্যেও লক্ষ্মী ছেলেটাকে বুকে চেপে বেঁচে আছে।

ছেলের কিছু হলে ও আর বাঁচবে না। নারায়ণ বুলাকে বিছানায় শোয়াল এবং ঘুমন্ত শিশুর ঠোঁটে চুমু খেল। নিজেও বুলার পাশে শুলো এবং তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। লক্ষ্মীর আনন্দে চোখ গড়িয়ে জলের ধারা নামল; নারায়ণ কতদিন বুলাকে এমনি আদর করেনি। লক্ষ্মী আধপোড়া কয়লা দিয়ে উনুনে আঁচ দিল। এমন সুখের দিন ওর কতদিন আসনি।

এমনি পর পর তিন দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলল। বিকেলে রোজ বুলাকে নিয়ে বের হত নারায়ণ, রাতে ফিরত চাল ডাল ইত্যাদি খাদ্যবস্তু নিয়ে। বুলা ঘুমিয়ে পড়লে নারায়ণ রান্নাঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর পাশে বসত, নানান গল্প করত, লক্ষ্মীকে ছুঁতে চাইত। লক্ষ্মী কপট কোপ দেখাত—এই কি হচ্ছে। ঘুরেফিরেই জিজ্ঞাসা করত—হ্যাগো, বুলাকে নিয়ে রোজ রোজ কোথা যাচ্ছ?

—এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে।

—চাল ডাল কেনার পয়সা কোথা পাচ্ছ?

—এক দোকানদারের ছ ধারে আনছি।

লক্ষ্মী কিছুটা বিশ্বাস করত, কিছুটা বিশ্বাস করতে পারত না। শেষে হাল ছেড়ে দিত। বস্তুত সংসারটাও চলছে পাল ছেঁড়া নৌকোর মতো টাল মাটালে। স্রোতের খেয়ালে ভাসছে। কী করতে পারে লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী অনেক আগ থেকেই ওৎ পেতে বসেছিল, নারায়ণকে সামনে পেয়েই, ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোল থেকে ছিনিয়ে নিল বুলাকে, চিৎকার চেঁচামেচিতে ছেলেটাও কেঁদে উঠল। এমন আচমকা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না নারায়ণ। যখন বুঝল, আমতা আমতা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিষ্ফল চেষ্টা ও করল—কে বলেছে ওসব কথা, ও সব মিথ্যে।

লক্ষ্মী ভেংচে উঠল—বাজে কথা? মিথ্যে কথা? তুমি ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে ঘুরে বলনি—বাবুরা, আমার ছেলেটার চোখের চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য করুন। আমি ভিখিরী নই বাবু, একজন খাটাই শ্রমিক। আর সে পয়সা এনে গিলেছ।

নারায়ণ বুক চিতিয়ে বলল—বেশ করেছি। লক্ষ্মীও ক্রোধে যেন উন্মত্ত হয়ে গেল। নারায়ণের আনা চাল ডাল থলে শুদ্ধ গভীর নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। নারায়ণ সব তাকিয়ে দেখল; তার পর বিছানায় শুয়ে নর্দমার নোংরা গন্ধ আর চামড়ার গন্ধ মেশান বাতাস থেকে নিঃশ্বাসের পরমাণু সংগ্রহ করছিল। বুলা প্রচণ্ড চিৎকার করছিল। লক্ষ্মী মেজের উপরে বসেছিল। হাপরের মধ্য থেকে চাপ দিলে যেমন হাওয়া বের হয়, ও তেমনি শব্দ করে করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

জানালার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ রৌদ্র বল্লমের মত বিঁধছিল। লক্ষ্মীর দেহটা

ক্ষুধার ক্লান্তিতে ভীষণ অবসন্ন মনে হল। ও বুঝতে পারল নারায়ণও জেগে উঠেছে। বুলা এখনো ঘুমিয়ে রয়েছে। জেগে উঠলে খুব গোলমাল বাধাবে। কি খেতে দেবে ওকে লক্ষ্মী। ওদের বারোয়ারী ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রাণচাঞ্চল্য সেই ভোর থেকে। কোন ঘরের রান্নার আওয়াজ আসছিল, কড়াই-এ তেল চাপিয়ে কি ভাজছিল, নয়নের বৌ টগর হয়তো। গতকালের উপবাস, আজ সারাদিনও কিছু জুটবে এমন আশা করতে পারে না লক্ষ্মী। অথচ রান্নার ছমছমে গন্ধ ওর মনে খাওয়ার ইচ্ছা উদ্রেক করল। ওর চোখ জলে ভরে গেল। ইচ্ছে হল একবার বুলাকে জাপটে ধরে চুমু খায়। চুমু খেল না, পাছে বুলা জেগে যায়। ক্রমশ প্রখর রৌদ্র-রশ্মি ঘরের জমাট অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্মী অলস চোখে শ্রীহীন সংসার দেখল—লক্ষ্মীর তাক, বিয়ের সময়ের বিবর্ণ ছবি, যম-রাজার দরবারের পট। তার পাশে একটা মাকড়সা পরম যত্নে জাল বুনে চলেছে।

এক সময় বুলা উঠে বসল, অমনি লক্ষ্মীর বুকের গভীরে এক কাঠঠোক্রা পাখি যেন ঠক্‌ঠকাস আঘাত হানল। লক্ষ্মী মনে মনে বলল—বুলা সোনা আমার, তুমি শান্ত ছেলের মত বসে থাক। লক্ষ্মী বিছানা ছাড়ল, পরণের কাপড় সোছগাছ করল; অভ্যাসবশে লক্ষ্মীর পটের দিকে তাকিয়ে জোড় হাত করল। দরজা খুলল, হাট করে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বুলা কান্না জুড়ে দিল। ও বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে কখনো আস্তে কখনো জোরে শব্দ করে আকাশের দিকে মুখ করে কাঁদছিল। ঈশ্বরের কাছে যেন নালিশ জানাচ্ছিল। একবাটী আটাও যদি ধার পেত লক্ষ্মী। না, সে পাবে না। আজকাল কেউ লক্ষ্মীকে আর ধার দিতে চায় না। বরং সবাই এড়িয়ে চলে। আগে বুলার কান্না সহ্য করতে পারত না লক্ষ্মী, এখন পারে। বুলা এখন ঝমঝমে বর্ষার মত শব্দ করে একটানা কেঁদে চলেছে। লক্ষ্মী কী করবে! আজ দেড়দিন ওরা উপবাসী হয়ে আছে। টগর দুখানা রুটি এনে বুলার হাতে গুঁজে দিল। টগরকে এখন লক্ষ্মীর দেবীমূর্তি মনে হল। রুটি পেয়ে ছেলেটার কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। ওর চোখের নিম্নদেশে শিশিরের মতো, মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু টলমল করছে। লক্ষ্মী সবই দেখেছে অথচ কিছুই দেখতে পায়নি এমন একটা ভাণ করল। টালির চালের উপর বসা কাকগুলো বুলার রুটি খাওয়া দেখছিল। ওর ভীষণ উৎকণ্ঠা হচ্ছিল পাছে কাকগুলি বুলার হাত থেকে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এমনি ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মীর গা গুলিয়ে এলো, ও দাওয়ায় বসে মাথা নীচু করে নর্দমার দিকে ঝুকে বসল এবং অনেক ওয়াক করার পর সামান্য একটু বমি করল। একটু হলদে পিত্তির জল। ওর মাথা ঘুরছিল। ও হাঁড়িকুড়ি খুঁজে খুঁজে একমুঠো চাল পেল। চাল মুখে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে ফেলল। তারপর মেঝেয় কাপড় পেতে শুয়ে পড়ল। বুলা প্রসন্নমনে ওর পাশে বসে আগডুম বাগডুম ছড়া কাটছিল।

নারায়ণ উঠল। বারান্দায় বসে বালতির জলে মুখ ধুলো। প্যান্ট পরে

ভিউটির হাওয়াই শার্টটা গায়ে গলাল। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে বুলাকে কোলে তুলে নিল। ছেলেটাকে চুমু করে নিয়ে যাচ্ছে এমনি সন্তর্পণে লক্ষ্মীর দিকে নজর রেখে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্মী চোখ বুজে শুয়েছিল, সবই টের পেল, কোন সাড়া দিল না।

নারায়ণ যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে রাত্রিতে পা বাড়িয়েছে। ওকে যথেষ্ট ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ও চোরের মত ঘরে ঢুকল। এবং যে কোন মুহূর্তে লক্ষ্মীর আক্রমণ আশংকা করছিল। বুলাকে কোল থেকে নামাল, হাতে এক ঠোঙা বিস্কুট দিল, থলিটা মেঝের মাঝখানে রাখল। তক্তপোষে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

আশ্চর্য! লক্ষ্মী কোন প্রতিবাদ করল না, চেঁচামেচি করল না। শান্ত ভাবে বারান্দায় গেল। কতগুলি হাঁড়িকুড়ি টিন জমান ছিল। ও হাতড়ে হাতড়ে কতগুলি ধোয়া করল। বের করল। উনানে আঁচ দিল এবং বারান্দার নীচে লম্বা কালি উঠানের ঠিক মাঝখানে উনানটাকে বসিয়ে তাঁতা পাখা দিয়ে সজোরে হাওয়া করতে লাগল। ও ইচ্ছে করে জানান দিতে চাইল যে ওদের ঘরে রান্না হচ্ছে। ধীরে পরিপাটি করে মাংস কাটল, পেঁয়াজ কুচাল, আলু কাটল। বারান্দায় বসে ভীষণ শব্দ করে করে মশলা করল।

নারায়ণ তক্তপোষে বসে বিড়ি টানছিল, খুক খুক কাশছিল কাশতে কাশতে মাঝে মাঝে ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছিল। রান্না সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়িটাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কাঁসার থালাগুলি অর্ধাভাবে এতদিনে উধাও। সুতরাং লক্ষ্মী কলাই এর থালায় ভাত বাড়ল। নারায়ণকে ডাকল—খেতে এসো। বুলাকে জাগালো—ওঠ বাপ। ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওকে টেনে তুলে বসাল। বুলা মাংসের গন্ধ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মামসো।

ওদের তিন জনের খাওয়া সুরু হয়ে গেছে। প্রচণ্ড গোগ্রাসে প্রতিযোগিতা চলছিল—ভোজনের। মাংসের ঝালে বুলার অন্ধ চোখ গড়িয়ে জল পড়ছিল। বুলা বলল—জল। একসময় নারায়ণের দৃষ্টি যেন কেমন হয়ে গেল। এ দৃষ্টি চেনে লক্ষ্মী। দুষ্ট ছেলেরা যেমন অন্য ছেলের সঙ্গে ঝগড়ার অছিলা খোঁজে, তেমনি নারায়ণ হাসতে হাসতে লক্ষ্মীর থালা থেকে একটুকরো মাংস তুলে নিয়ে গেল। লক্ষ্মীও মাংসের টুকরো নিয়ে টানাটানি সুরু করে দিল। ও কপট ক্রোধে চোখ পাকিয়ে বলল—পেটুক গোসাই। নারায়ণ মাতালের মতো টলমল করছিল, বলল—এবার তোকে খাব। লক্ষ্মীকে একহাতে আবড়ে ধরল, অন্যহাতে মাংসের টুকরোটা লক্ষ্মীর মুখে পুরে দিয়ে বলল—এই খা। লক্ষ্মী ছটফট করছিল, ঝাপাঝাপি করছিল; দুচতুর-প্রেমিকার মতো হাসছিল।

বুলার কান্নার সব হাসি ডুবে গেল বুলা ভয় পেয়ে কাঁদছিল।

ওর গান শুনতে খুব ভালবাসে—ওর গানের চাইতেও ভালবাসে ওকে। দুরন্ত যৌবন অথচ ওর ভালবাসা বড় ভীতু। মালাও পারেনি রজতদাকে সাহস যোগাতে। কী করে পারবে। স্কুল ফাইনাল পাশ : ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করে। ওদের বাড়ির ইলেকট্রিক খারাপ হলে রজতদাই সারিয়ে দেয়, পয়সা নেয় না। বাবা সব সময়ে বলেন রজত ছেলেটা বড় ভাল। সম্প্রতি রেডিও মেকানিক পাশ করেছে। সুপুরুষ চেহারা ; পুরুষের মতই বুক ফুলিয়ে চলে সোজাসুজি তাকাতে পারে। মালা ছোটবেলায় ওদের বাড়ি খুব যেত। রজতদার মা ও ইলাদি ওকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ইলাদির মতে অবশ্য রজতদা ওকে সবচাইতে বেশী ভালবাসে। মালাও যে বোঝেনা তা নয়। এবার মহালয়ার আগের দিন ওদের রেডিওটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। মালাই ছুটে গিয়ে রজতদাকে খবর দেয়। রজত সন্ধ্যার পর এসে দু'ঘণ্টা ধরে রেডিও মেরামত করে। মালার সাথে অনেক গল্প করেছিল সেদিন। কিছু টাকা জমাতে পারলে কয়েকটা ইন্‌সট্রুমেণ্ট কিনে একটা রেডিও মেরামতের দোকান দেবে। এসব কথা মালাকে শোনাবার কী অর্থ থাকতে পারে। পাড়ার আর পাঁচটা কাজিল ছেলের মত রজতদার মুখ থেকে কখনও বেফাঁস কথা শোনেনি। রজতদাকে বাবারও ভারি পছন্দ। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বাবা কখনই ওকে জামাই হিসাবে মেনে নিতে পারবেন না। তাছাড়া ইলাদি ও বিলুর নামে পাড়ায় রটনায়...। এসব বুঝেও যদি সে এগিয়ে যায় তবে বাবাকে দারুণ আঘাত দেয়া হবে। বাবার প্রতি এতবড় অন্যায় সে কিছুতেই করতে পারবে না। অথচ বিএ এম-এ পাশ না করলেও রজতদা ওরকম অনেক পাশ করা ছেলের চাইতে বেশী রোজগার করবে।

আঠার বছরের প্রেম ত্যাগেই সার্থকতা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু রজতদা যদি কখনও নিজের থেকে এগিয়ে আসে ?

—মালা তুই কি গান খুঁজে পাচ্ছিস না ? বাবার ডাকে মালা লজ্জিত হয়। ওর গান কখন থেমে গেছে।

—ওই গানটাই আবার ধরনা ; ও গানের কি শেষ আছে, না ও গান শুনতে ক্লান্তি আসে। মালা এবার শেষ থেকে সুরু করে।

বাসনা যখন বিপুল ধূলায়, অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র.....

মালার গান ভেসে এসে আছড়ে পড়ে অন্ধকার ঘরের মাঝে। ওর গান শোনা মাত্র রজতের হাতের কাজ থেমে যায়। ঘরের কোণায় জীর্ণ খাটে শায়িত অরাজীর্ণ মা হুংযোগের অপেক্ষায় থাকে—তুই ত কিছু করছিস না বাছু, বাতিটা নিভিয়ে দেনা, চোখে বড্ড লাগছে। মালা ভারি ভাল গায়, ওর গান শুনে মনটা একটু শান্তি পায়। রজতও উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে জানালায় এসে দাঁড়ায়—মা-কি ওর মনের কথা বুঝতে পারে? মায়ের জন্তে একটা রেডিও রজত নিজের হাতে বানাবে—মা সারাদিন একা একা পড়ে থাকে। মাথাটা জানালার ঠাণ্ডা রডের মাঝে গুঁজে দেয়। রজত জানেনা যে মালা জানে সে জানালায় দাঁড়িয়ে তার গান শুনছে। তবে রজত লক্ষ্য করেছে এ ঘরের বাতি নেভার সাথে সাথে মালা যেন গলাটা একটু চড়িয়ে দেয়। বড় ভাল গান ধরেছে; রজতের কাঠখোট্টা মনটাও এ গান শুনে ডুকরে কেঁদে উঠতে চায়। রজতের মনে হয়, মানুষের মনে গান না থাকলে মানুষ পশুরও অধম হয়ে যেত। মালার গলা ভারি মিষ্টি। কাছে বসে একদিন যদি গান শুনতে পেত! নিবারণবাবুর প্রতি হিংসা হয়। তা বলেও সে নিবারণবাবুর মৃত্যু কামনা করে না। এমনিতেই পৃথিবীতে সৎ ও ভাল মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে।

হলুদ রঙের ফ্রক পরা ছোট্ট মালা দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। আর পাঁচটা মেয়ের থেকে মালা স্বতন্ত্র। বিলু ও মালা এক সাথে পড়ে। বিলুটা কেমন সেকে বাবু হয়ে গেছে। সাজগোজকেও একেবারে বেপরোয়া। দিদির কথা অবশ্য আলাদা; মেয়েদের চাকরি করতে হলে ওরকম সাজগোজ করতে হয়। রজত আরও অনেক চাকরি করা মেয়ে দেখেছে, তাদের চাইতে দিদির সাজগোজ অনেক দুরস্ত। বেচারা দিদিটা সংসার মাথায় করে রেখেছে। পাড়ার লোক পাঁচ কথা রটালেও রজত জানে ওর দিদি ইলা গঙ্গার চাইতে পবিত্র। যারা ওর কাছে আসে তারা ওদের ইউনিয়নের নেতা। দিদি ইউনিয়নের সভ্য হওয়াতে ইউনিয়ন নানা ভাবে উপকৃত। অনেক মেয়ে সভ্য হয়েছে। ওরা এখন চেষ্টা করছে দিদিকে কমিটির মেম্বার করতে। দিদি বেচারা হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারছে না। আর ওরাও রোজ রোজ বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করছে। সবাই খুব ভাল। কারো বাড়িতে পাঁচটা লোক আসতে দেখলে পাড়ার লোক হিংসায় বদনাম রটায়। দিদির কাছে লোকজন আসা যা-ও পছন্দ করত না। ওরে ওরে দিদির সাজা দেখে টিপ্পনি কাটত।

রজত কায়দা করে মাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছে। নিন্দা রটাবার আগে মানুষ একবার ভেবে দেখেনা। বিশ্রী মেয়ে রাত দিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। আরে বাপু সখ করে কি কোন মেয়ে রোদ বৃষ্টি মাথায় করে ঘুরে বেড়ায়? কলেজ করে এ বেলা ঢাকুরিয়া ও বেলা বেহালা দু' দুটো টিউশনি করতে হয় বেচারাকে। ওর দোষ, কেউ মিষ্টি করে দুকথা বলতে আসলে ও পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়। দিদির মত মুখ বুঁজে সহ্য করে না।

রজত এ সবের নীরব সাক্ষী। সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে সব মুস্কিল আসান করে দেবে। দিদিটার জন্যে দুঃখ হয়। বীরেনের সাথে দিদির শেষ কথাবার্তা ও পাশের ঘর থেকে শুনেছিল। "রজতকে মই কাঁধে নিয়ে ঘুরতে বল, সংসার খরচ ও একাই কামাতে পারবে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। বিয়ের পর তোমায় একদিনও চাকরি করতে দেবনা। বীরেন মুখার্জী তোমাদের সকলের উপার্জনের দ্বিগুণের বেশী উপার্জন করে। আমি যদি রজত হতাম বোনের উপার্জনে বেঁচে থাকার চাইতে……।" বীরেন কথা শেষ করতে পারেনি। দিদি এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার দিয়েছিল—'তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী নই, তুমি যেতে পার, বীরেন উঠে দাঁড়িয়েছিল। 'তোমার চাইতে হাজার গুণ সুন্দরী-----অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে রাজকন্যা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে……।' কলেজ থেকে বীরেনের সাথে আলাপ পরিচয়। তখন ছিল ছাত্র নেতা। এখন টাই পরা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ; বস-এর বউয়ের পায়ে তেল মাখিয়ে সেলস অফিসার হতে চলেছে। বীরেনটা একেবারে আনোমার, ভাগ্যিস দিদির সাথে……, রজত ভাবে। সমস্ত কিছুর জন্যে রজত নিজেকে দায়ী করে—ও কেন আর পাঁচজনের মত লেখা পড়া শেখেনি। বি. এ. পাশ না করলে মানুষের মর্যাদা কেউ দেয় না। কোট প্যান্ট টাই পরা বীরেন যখন রোজ আসত কেউ দিদির নিন্দা করতে সাহস করেনি। এমন কি মা পর্যন্ত……। আর সে নিজে মালাকে বিয়ের প্রস্তাব করার কথা কল্পনা করতেও সাহস পায়না! প্রেস রিপোর্টার বাবা খাদ্য আন্দোলনের রিপোর্ট নিতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরল। কলেজের গেট অব্দি গিয়েও তাকে তাই ফিরে আসতে হ'ল। আশুতোষ কলেজের পেছনে "ইস্ট ইলেকট্রিক কোং" সাইন বোর্ড ঝোলান দোকান থেকে যাত্রা সুরু। সকালে রোলিং শাটার তোলা থেকে মালিকের জন্যে কেটলি হাতে

চা নিয়ে আসা। আশুতোষ কলেজের বাড়ি নেওয়া অব্দি ডিউটি। এক্সারসাইজ করা দেহটাকে বিলিয়ে দিতে হল মাসিক ষাট টাকার বিনিময়ে। নিজের চেষ্টায় ধাপে ধাপে এগিয়ে আসলেও বীরেনকে সবাই যে সম্মান দেয় সে সম্মান ওকে কেউ দেবে কি? দিদি বিনু মালা? ও তো গ্রাজুয়েট নয়। কিন্তু মালা কি ওকে ভালবাসে না? সেদিন রেডিও সারাবার সময় মালা দু'ঘণ্টা ঠায় ওর কাছে বসেছিল। দু দশ মিনিটের কাজ রজত ইচ্ছা করে দু' ঘণ্টা লাগিয়েছিল। ওর মনে মনে ইচ্ছা হলেও বলতে সাহস হয়নি—মালা, একটা গান শোনাও।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ, কোণে পড়ে থাকে দীন হীন মন···

মালার গান সত্যি করুণা ধারা বয়ে আনে রজতের জীবনে। রেডিও মেকানিক সার্কিট ডায়গ্রাম ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে সে গান শোনে। গান ও গায়িকা ওর জীবনে চন্দ্র সূর্য—প্রত্যুষের সূর্য, সন্ধ্যা রাতের চাঁদ—দূর আকাশের জীবন্ত সত্য—আকাশটা কি দূরেই থাকবে চিরকাল?

সবুজ উদ্যান-সবুজ উপত্যকা

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুনীল বসু

[পূর্ব উল্লিখিত ডক ষ্ট্রীট তিনতলার ঘর—দুপুর। আস্তে আস্তে মণিকা এসে দাঁড়ালো]

দাদা আজকাল তুমি কোথায় থাক ?

আমার কত কাজ। কয়েক বন্ধু ট্যুরে যাচ্ছি। সব জোগাড় করতে হচ্ছে।

[পাশেই একটা তোরঙ্গে মণিকার চোখ পড়ল। তালাটি খোলা। জামা-কাপড় গোছানো]

কবে যাচ্ছো ?

আজই—সন্ধ্যায়।

ফিরবে কবে ?

ঠিক নেই। প্রথম পুরী যাব। ওখান থেকে কোথায় যাব ঠিক করিনি।

বেলা হয়েছে—ভাত খাবে না—চল।

তুই দিতে যা—যাচ্ছি।

(মণিকা চলে গেল)

মন—যখন ওরা সব জানবে। যেদিন আমি গীতাকে নিয়ে এখানেই ফিরব—সেদিন কী ভাববে আমাকে ওরা—খুব কী ঘৃণা করবে—খুব কী ঘেন্না ভাববে—ভাবুক যা খুশি—আমার করবার কিছুই নেই।—যখন শুনবে আমি ধাপ্পা দিয়ে গীতাকে গ্রহণ ক'রেছি—ওরা টিটকিরি দেবে না ? দিক্—পরোয়া করি না ! কিন্তু গীতা দেবী কী মাথা খুঁড়বেন ?—নিশ্চয়ই একটা কেউটে সাপের মতো গর্জে উঠবে, আর তখন অন্তত আমি, এই আমি তখন ওর মুখে প্রমিতির মুখ দেখবো—আ—কিন্তু আমি যে সাঁপুড়ের বাঁশি—যখন জানবে গীতা, ওর স্বামী একজন কবি—একখানা বই পাওয়া যায় বাজারে—নাম—

'মাঠের বাঁশি'—যখন জানবে দু'খানা সস্তা নোভুন বই ছাপাতে দিয়ে পাঁচশো টাকা পাবে—উপরন্তু যখন জানবে যে—মনটি সোনা দিয়ে তৈরি, তখন ওর কেউটে সাপের ফণা নরম হয়ে গুটিয়ে আসবে—কুঁকড়িয়ে ছোট হবে।—রীতা যখন জানবে—তার 'ইয়ে' গ্রাজুয়েট নয়—চাকরি ক'রে না, পঞ্চাশ টাকা মাইনেরও—তখন কাঁদবে—অভিশাপ দেবে—তারপর ঘুমিয়ে পড়বে—মনকে বোঝাবে—দেখি কতদূর ভাগ্যের পরিহাস! কিন্তু আমি জানি—আমি তখন কী করব—! ধাপ্পা দিই নি রীতা—তোমাকে পেয়েছি এবার আমার শক্তি দেখো।

[টালিগঞ্জ এক্সটেনশন—সমরেশ বসু'র বাড়ি—রাত গভীর! দোতলার পাশাপাশি দুই ঘরে। প্রশান্ত—রীতার বিয়ের আগের রাত্রি। ঘড়িতে টং টং ক'রে দেড়টা বাজলো। গাছের পাতার মর্মর শোঁ শোঁ হাওয়া]

শুনছ!

শমিতা!—এখনো ঘুমও নি—

কাল প্রশান্তদার বিয়ে—আমি কী ভাবছি জানো—

কী—

তোমায় যা ছুয়ো দেবে লোকে।

তা ঠিক—সমরেশ-শমিতার বিয়েতেও লোকে কী ছুয়ো দেয় নি—

সেখানে দুই পক্ষেরই আগে থাকতে জানাজানি ছিল—

এখানে নয় বিয়ের পরেই জানাজানি হ'বে! আর প্রশান্তর অবস্থা নিজে চোখে দেখেই আমি ওতে না করতে পারলুম না। প্রমিতির জন্যে—অমন একটা 'ক্যারিয়ার' নষ্ট হ'য়ে যেত। আর ওর মতো বন্ধু আমার আর কে আছে?—

যেহেতু প্রশান্তদা'র জন্যে শমিতাকে পেয়েছ—

সে কথা কী খুব মিথ্যে?

খুব সত্যি!

বিয়ের পর কী ওরা এখানেই থাকবে?

বলা তো যায় না—বাড়িতে যদি—ঘরো, আয়গা না পায়, এখানেই রাখতে হ'বে ওদের আপাতত।

প্রশান্তদার চাকরি—

একটা জোগাড় করতেই হ'বে--যেমন ক'রে হোক—কয়েকজনকে ব'লে কয়েও রেখেছি।

কিন্তু দেখো, এতো শান্তভাবে কী বিয়ে ভালো দেখায়?

দেখ—জিনিসটি যদি গোপন না হোত—তাহলে ঢাক পিটোতে বারণ করতুম না।

(পাশের ঘর—একটা আবছা মোমবাতি জ্বলছে—সুন্দর একটি খাটে প্রশান্ত শুয়ে আছে—)

মন—কাল তোমাকে পাবো আমি! কাল, আগামী কাল রাতে এতোক্ষণে তুমি আমার কাছে। রীতা—রী—তা, কিন্তু আমার ভয় করছে—একটু, সামান্য একটুই। কাল থেকে আমার দায়িত্ব! যে মধুর দায়িত্ব আমি প্রতিদিন নিতে চেয়েছি! কাল সারা দিন আমার কেমন যাবে—ঈশ্বর তুমি আমার সংগে থেকো সারাক্ষণ—আমি এই প্রশান্ত বসু—যে এতদিন ছিল একলা—কাল থেকে—তার জীবনের আধখানা, সত্তার আধখানা অন্যের—এক সোনার পরীর মতো তরুণীর—। কাল থেকে সেই মেয়ের কর্ণধার আমি—তাকে নিয়ে ভালোবেসে যা খুশি করতে পারি,—কেউ বারণ করবে না,—কেন না সে আমার—একান্তই আমার!

[২৬ নং, কলেজ ষ্ট্রীট—রীতা শুয়ে আছে। তার বাঁদিকে দেয়াল—ডান দিকে—মা, শান্তি, বুলি-টুবলু—]

মন—কোথা দিয়ে কী হোল কিছুই বুঝতে পারছি না—সবই রূপকথার রঙিন আলো, আর বাসনার সোনার জাল দিয়ে জড়ানো! কী দেবো ওকে আমি, কী আছে আমার; এই যে ফুলের মতো ফুটে উঠেছি—মাথার সোনালি চুল—মুখের রেখায় শিল্পী যৌবনের কারুকার্য—শুধু কী এইটুকুই ওকে দেবো। আমি ওর—একান্তই ওর—আমায় নিয়ে কী করবে—কাঁদাবে-হাসাবে—দুঃখ দেবে—ভালোবাসবে—আমায় পড়তে দেবে না—ঘুমতে দেবে না—দুষ্টুমির উৎসবে সময় আমার এলোমেলো ক'রে দেবে—দিক—দিক—আমায় নিয়ে যা-খুশি করতে পারে করুক—আমি প্রেম দিয়ে সব অত্যাচার সহ্য ক'রব। যদি অসুখ ক'রে—আমি রয়েছি কী করতে। যদি রাগ করে, যদি কথা না বলে, পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো। বলব—কী চাও; সব দিয়েছি, এখনো তুমি ভুল বুঝবে। চিরুনি

কই?—উঃ অস্থির ক'রে দিচ্ছ—কিছুই তুমি খুঁজে পাওনা। সরো-সরো—রান্নাঘরে বিরক্ত কোরনা—। রান্না করতে গিয়ে তুমি হাত পোড়াবে—সে হ'বে না; আমায় থাকতে দাও রীতা! না। আঃ, বড়ো বিরক্ত ক'রো তুমি। ওকি, দেখি, দেখি, কী লুকোচ্ছো—কী আবার, ফোস্‌কা কী কারো পড়ে না। এতো হৈ চৈ করছো কেন? সেরে যাবে, শুকিয়ে যাবে, মুখ অন্ধকার করবার কী আছে! তুমি এখনো ভাত খাওনি; এই খাবো। এতো রাত করে কেন? কখন শোবে? তুমি ঘুমোও না বাপু। আমার জন্যে ভাবতে হবে না আঃ—এতো জল ঘাটো! কে তোমাকে বলেছে আমার গেঞ্জি সার্ট কাচতে? ধোপার বাড়ি দিলেই পারো। তুমিই বলো না খরচা কমাতে—তাই বলে তোমার শরীর নষ্ট করতে বলিনি।...আমি তোমায় কী দিতে পারি?—দেবতার মতো তুমি। আমায় শুধু বাঁচাও—আমি রজনীগন্ধার গন্ধে বিভোর··· কাল শুভদৃষ্টিতে কেমন করে তাকাবো—কান্নায় আমার চোখ ভারী হ'য়ে আসবে না—তুমি তাকিও আমি মূর্তির মতোই চুপ ক'রে থাকবো! কোন হৈ-চৈ হ'বে না—এ কী সাহেবী বিয়ে? তোমার এই বিলীতি রুচি কেন? শুধু ফুলের তোড়া, মন্ত্রপড়া, রাখিতে হাত বেঁধে নেওয়া! বেশ তাই হোক, আমারও বাজি-বাজনা-গোলমাল-দম-আটকানো লোকজন, শাখের সুর, উলুর হাজার সব ভালো লাগে না। শুধু একটি করুণ সানাই থেকে থেকে কাঁদবে—বেহাগের সুরে তার বুক বাঁধা; এটুকু কিন্তু বেশ লাগে—ভালো লাগে না তোমার? ঈশ্বর—কাল তুমি আমার সংগে থেকো—

(আবছা-পট পরিবর্তন)

[২৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট—বিয়ের রাত—বাড়িময় আলো—সামনের দরজাটা খুব সাধারণ ভাবে সাজানো! গোটা তিন চার লোক বার হোল—; গোটা তিনেক লোক ঢুকলো। শান্ত সুরে সানাই বাজছে—বাড়িতে গোলমাল নেই; ছবির মতো লোকগুলি চলা ফেরা করছে। একটি ছেলে গোলাপের তোড়া নিয়ে ভিতরে ঢুকলো। সদর দরজায় নরেশবাবুর দাড়ানো, তার পাশেই একটি ছোট্ট ফ্রক পরা সুশ্রী মেয়ে—হাতে রূপোর রাংতায় মোড়া খিলি পানের রেকাবি— যারা বেরিয়ে এলেন—তাদের মধ্যে—]

নরেশ—এই যে গোপালবাবু—একটি পান ইচ্ছা করুন—আপনাকে কী একটা গাড়ি ডেকে দেবো—

গোপালবাবু—(একটি পান তুলে নিয়ে) না, না, অশেষ ধন্যবাদ, তার প্রয়োজন হ'বে না—চমৎকার জামাই। রীতির সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। একেবারে ছেলেমানুষ—কিন্তু মা-বাপ নেই—একেবারে বেচারি—আহা—

নিতিকণ্ঠ—চমৎকার ভোজন করা গেছে। এতো পরিচ্ছন্ন—পরিস্থিতিটি এতো ঠাণ্ডা, বাঙালীর বিয়েতে এমন হয়ই না।

নরেশ—আপনাদের সকলের আশীর্বাদে—

নিতিকণ্ঠ—সে আর বলতে—আশীর্বাদ করি 'সুখে থাকুক'।

[ওরা চলে গেলে সমরেশ বেরিয়ে এলো]

সমরেশের মন—নির্বিঘ্নে বিয়ে তো হ'য়ে গেল—কিন্তু সব সময় এমন 'প্যালপিটেশন' হ'চ্ছে কী ব'লব—কাল দুজনকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্তি। প্রতি মুহূর্তে বিপদ মাথায় ঝুলছে—কত বড়ো একটা ফাঁকির স্তূপের পরে দাঁড়িয়ে আছি—আমি, প্রশান্ত, রীতা!

[পট ঘুরলো। ঐ বাড়ির একটি পরিচ্ছন্ন ঘর—আলো নেবানো—চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে—খাটের এক কোনে প্রশান্ত—খানিকদূরে ওর পাশে রীতা]

রাত কত?

(কোন উত্তর নেই, শুধু গীর্জার ঘড়িতে দু'টো ঘোষণা ক'রল)

দুটো। অনেক রাত হ'য়েছে তো!

তুমি শুভদৃষ্টির সময় তাকাতে পারো নি!

না।

পারলে না কেন?

পারিনি। ভয় ক'রছিল!—তুমি দেখেছিলে?

দেখলুম—তুমি চোখ বুজে আছো, তোমার চোখের কোণায় জল—(একটু থেমে) কাঁদছিলে কেন রী-তা।

ও কথা শুনতে চেয়ো না—

কেন?

আমার গোপন কথা!

রীতার মন—আনন্দেও যে কাঁদতে হয়, আজ প্রথম বুঝলুম—

রী-তা—

কী ?

কাছে এসো·····কই এসো·····কই !

তুমি—ঘুমবে না—

ঘুমবো—তুমি এসো·····এসো·····রীতা—

[কাছে সরে আসে ! শুরু ! শান্ত ! ভীরু ! মুখ নিচু দিকে নামানো]

তুমি—আমাকে পেয়ে সুখী হ'য়েছ ?

তুমি আমার স্বপ্ন রীতা !.....রীতা.....রী—

উঁ—

আমাকে তোমার ভালো লাগছে না—

কেন লাগবে না—

না। এম্নি বলছিলাম ! অবশ্য লোকে আমাকে খুবই ভালো ভাবে !—

তার মানে ?—রীতা চোখ খোলে—ওর স্বপ্নালু ঠাণ্ডা চোখে একটু হাসি—

মানে—সত্যি কী আর অত ভালো আমি ? না—না—মানে বলছিলুম কী তোমার মতো ভালো মেয়ের যোগ্য হওয়ার মতো ভালো আমি নয় হয়ত—

সেটা বরঞ্চ আমাকে বললেই মানায় ?—

দূর—তুমি জানো না—আমি বড়ো মন্দ—

(রীতা—সম্পূর্ণ চোখ খুলে) কেন ?

মানে আমার কতকগুলো দোষ আছে আর কি ?

(বিস্ময়ে—ভয়ে) কী দোষ ?

এ-মানে—আমি বড়ো—ব্যথা দিই—মিথ্যে কথা বলি—বড়ো ফাঁকি দিই—এর পরেও আমায় ভালোবাসবে রীতা ?

এসব বলছ কেন তুমি ?

মানে তুমি একটা আদর্শ পুরুষ-টুরুষ আমায় না ভেবে বসো ; মিথ্যেও বলি, ফাঁকিও দিই—ব্যথাও পাবে তুমি ! সইতে পারবে এসব ?

আমায় তুমি পরীক্ষা করবে ? তোমাকে তো যুধিষ্ঠির হ'তে বলিনি, ফাঁকি দেবে তুমি আমাকে ? দিও—

না-না—ফাঁকি না—মানে তোমাকে ফাঁকি দেবো কী করে? সে কথা নয়—তবে তুমি ব্যথা দেবে ?—দিও ! সইতে পারবো !

পারবে সইতে রীতা—আমায় বাঁচালে—বাঁচালে তুমি—

(রীতা ক্রমাগত অবাক হয় ; প্রশান্তর হাতে হাত রাখে)—এতে তুমি এতো বিচলিত হচ্ছ কেন—এতে বাঁচাবার কী আছে—

তোমাকে পাওয়ার জন্য—এমন কাজ নেই যা আমি করতে পারতুম না !

আমার কী এতই মূল্য ?

হ্যাঁ ; আমার কাছে ! আচ্ছা রীতা, তোমাকে, শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি যদি খুব নীচ কাজ করতুম—তবু চাইতে তুমি আমায় !

ও কথা কেন বলছ ?

দেখছি তোমার ভালোবাসা কত গভীর।

পারতুম—পারতুম তবু চাইতে তোমায়। দোহাই, আর আমার পরীক্ষা কোরনা, আমি অতো খেলো নয়।

রীতা—

কী ?

যদি আমি—রাস্তার ভিখিরি হোতুম-বেকার, অশিক্ষিত, গরীব—তাহ'লে তাহলেও তুমি আমায় চাইতে ?

কিন্তু সত্যিই তাতো তুমি নও—তবে কেন ও কথা বলে দুঃখ দিচ্ছ ;—

বলো, বলো তুমি, তাহলেও তোমার কাছে আমার মূল্য থাকবে তো ?

এখনিই ব্যথা দিচ্ছ—আমায় কাঁদিয়ে তোমার কী লাভ ?

বলো তুমি রীতা—সামাজিক মূল্য—আমার যদি কিছুই না থাকতো তাহলেও পেতুম কিনা এই দেবীকে ? (রীতাকে বুকে টেনে নিল)

(কান্নায় গলা ভেঙে আসে) পেতে তুমি আমায়—পেতে—

লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—দেবী তুমি—

কিন্তু এসব কথা কেন বললে ?

আমি বড়ো সন্দিগ্ধ রীতা ;—তুমি আমার দুর্লভ ঐশ্বর্য ; তোমাকে সাবধানে, সযত্নে রাখতে পারবো কিনা সেই ভয়—

পারবে—পারবে—ভয় কোর না—আমার ভয় করে।

কী জানো ?

কী ?

না কিছু না—

বল না—

তোমাকে যেন ফাঁকি দিলুম—

কেন ? (রীতার মুখে বিস্ময়)

আমি তোমার যোগ্য নই—।

বিনয় !

দেখো একদিন বুঝতে পারবে।

হ্যাঁ বুঝতে পারবো যে তোমার যোগ্য আমি নই।—ঘুমো তুমি—

কাছে এসো.....আরো.....আমার রীতা.....রীতা.....

হেটো বই—হেটো ছড়া—হাটে হাঁড়ি

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা ভারতবর্ষে যে কোন জায়গায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেই ঘটনা নিয়ে ছোট্ট আকারের ছড়ার বই বের হত। সাধারণতঃ কেলেঙ্কারী বা লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল ছড়ার প্রধান বিষয়। এই সব বই দোকানে পাওয়া যেত না। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন থাকত না। এমন অনেক বই বেরিয়েছিল, যার মধ্যে সে দিনের বহু নামকরা এবং ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তির, যাদের সমাজের প্রতি মঙ্গলবোধ ছিল না, নাম-ধাম উল্লেখ করে ছড়া লেখা হয়েছিল। ফেরিওয়ালারা এই সব বই হাটে বাজারে, ইস্টেশনে, অলি-গলি ঘুরে বিক্রি করত। হাটুরে ফেরিওয়ালারা ছড়া কেটে সমাজের হাটহদ্দ প্রকাশ করত। যাকে বলে হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙতো।

বাঙালী সমাজের কথা আলোচনা কালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হাটে হাঁড়ি ভাঙা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "একটা হাঁড়িতে সিন্দুর মাখাইয়া 'লুইয়ের হাঁড়ি বলিয়া তাহার স্থাপনা করা হইত। লুইপাদ একজন প্রসিদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এখনও পশ্চিম ও দক্ষিণ রাঢ়দেশে প্রবল আছে। এই হাঁড়ি বসাইয়া লুইপাদের পূজা হইত। একটা খাসী বলিদান দিয়া তাহারই নাড়ীভুঁড়ি ঐ হাঁড়িতে পোরা হত। খানা-পিনা শেষ হইলে, অভিযোক্তা তাহার অভিযোগের কথা বর্ণনা করিতেন। তাহা শুনিয়া ঘোঁট হইত। প্রায়শঃ লাম্পট্যের অভিযোগই করা হইত। পত্নী, ভগিনী কন্যা, কাহারও সহিত ঘরের বাহির হইলে, নরনারী উভয়ের বিরুদ্ধে হাঁড়ি স্থাপনা হইত। তাহার পর এই নাড়ীভুঁড়ি পূর্ণ হাঁড়ি মাথায় করিয়া হাটের দিনে একটা কেন্দ্রস্থ বড় হাটে উপস্থিত হইতে হইত। হাট যখন জমজমা চলিতেছে, তখন হাটের মধ্যস্থলে কুৎসা কীর্তন করিয়া আছাড় মারিয়া হাঁড়ি ভাঙ্গা হইত। হাঁড়ি ভাঙ্গিলেই লম্পট নর-নারীর আর কুত্রাপি আশ্রয়ের স্থান মিলিত না, তাহারা সকলে অস্পৃশ্য 'ঠেকো' হইয়া থাকিত। একটা মজার প্রবচন এই উপলক্ষে প্রচলিত ছিল।

কাটল হাটে হাঁড়ি,
ছড়াল কুচ্ছার ভুঁড়ি ও নাড়ী,
দূর দূর ছোঁড়া ও ছুঁড়ী।"

সেকালের বহু ছোটো বই—ছোটো ছড়ায় দেখা যায়, লেখক ও কবিরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সমাজের নানা অনাচারের বিরুদ্ধে অভিনব উপায়ে প্রতিবাদ স্বরূপ অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণে ছোটো বই-ছোটো ছড়াগুলির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যঙ্গমূলক রচনা হিসাবে বিশিষ্ট মূল্য আছে। অধিকাংশ বইয়ের ভাষা সরল। ছড়াগুলির প্রাণ সম্পদ লোক জীবনের প্রতি গাঢ় অনুরক্তি। অখ্যাতনামা কবিদের কবিত্ব শক্তি নিতান্ত মন্দ ছিল না। সব মিলিয়ে চটি বইগুলি একশ্রেণী পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হত। অনেকে আদালতের চাঞ্চল্যকর মামলার নথিপত্র বাংলায় অনুবাদ করে চটি বই ছাপিয়ে ছিলেন। কোন কোন প্রকাশক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত চমকানো সংবাদ পুনর্মুদ্রিত করে ছোটো বই বের করেছিলেন। যেমন মধুসূদন চৌধুরী লিখেছিলেন (কল্কী অবতারের মোকদ্দমা) বই। সেকালে এক শ্রেণীর অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের উৎসাহে এই ধরণের ছোটো বই প্রচুর ছাপা হত। যেখানে কদর্য রুচি তাঁদের চোখে ধরা পড়তো, সেখানেই অখ্যাতনামা কবিরা ছড়ার মালা গেঁথেছিলেন।

এক দিকে সত্যনিষ্ঠ মানুষের জয়গান, অপর দিকে স্বার্থান্ধ, লোভী ও ক্ষমতাপরায়ণ মানুষের চক্রান্তের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন। যেমন আবদুর রশিদ খাঁ লিখিত বই (১৯০১ সালের নোয়াখালীর মোকদ্দমা—মহাত্মা পেনেলের বিচার)। সেকালে ইংরেজ বিচারপতি পেনেলকে নিয়ে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ওই সময় প্রায় প্রতিদিন পেনেল সাহেবের সংবাদ বেরোত। পেনেল সাহেবকে নিয়ে কয়েকটি ছোটো বই ও ছড়ার বই লেখা হয়।

সেকালে ছোটো ছড়ার ক্রেতা যথেষ্ট ছিল। এক বৃহৎ জনমণ্ডলীকে এই ছড়ার বই ক্ষণিক হাস্যরসে পরিতৃপ্ত করত। ক্ষুদ্র চটি বইগুলিকে সাধারণ মানুষ তুচ্ছ জ্ঞান করত না। সেকালে এগুলি জনসাধারণের মনে দাগ কাটতো। শুধু যে ব্যঙ্গবিদ্রুপের ছড়া ছাপা হত তা নয়। বহু বেদনার কাহিনীও ফেরিওয়ালারা বিক্রি করত। হাসি ও অশ্রুর মুক্তাবিন্দুর ছড়ার মালা নিয়ে

ফেরিওয়ালারা পথে পথে ঘুরত। সেকালের বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পটভূমিকায় ছড়া রচিত হয়েছিল। সেই হেটো ছড়া সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহণ করত। সেকালে এমন অনেক বই বেরিয়েছিল, যার মধ্যে উল্লেখ ছিল সেদিনের বহু ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তি, যারা নোংরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। হেটো কবিরা তাদের নাম-ধাম উল্লেখ করে ছড়ার বই বের করেছিলেন। সেই সব ব্যক্তিদের গোপন কথা দশের কানে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল হেটো ছড়ার উদ্দেশ্য। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হেটো বই ও হেটো ছড়া হাটে হাঁড়ি ভাঙতো। গোপন দোষ সাধারণের সামনে প্রচার করতো। যে সব কথা সংবাদপত্রে লিখতে সাংবাদিকেরা দ্বিধা করতেন, সেই সব কথা লিখে তিরস্কার করতে হেটো ছড়ার কবিরা সঙ্কোচ বোধ করতেন না। এই কারণেই সেকালে যারা ডুবে ডুবে জল খেত, সমাজে সমাজপতি সেজে এবং গোপনে নানা পাপ কাজে লিপ্ত থাকতো, এমন সব ভদ্দরলোক জীবেরা হেটো ছড়াকে সত্যি ভয় করতো।

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে একটি বইতে ছাপা হয়েছিল :

বৌ জব্দ চলবে না আর
চুলের মুঠো ধরে,
শাশুড়ীদের চোখ রাঙানী
চলবে না আর ঘরে।
হাড় জ্বালানী ননদিনীর
বাক্য বিষবাণ,
কথার কামড় যায় না সহা
ঝি-ঝি করা প্রাণ।

দেশের কালোবাজারীদের লক্ষ্য করে ফেরিওয়ালারা ছড়া কাটতো :

কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে
দেশে হাহাকার তুলে,
আগুন দরে জিনিস বেচে
মারা মমতা ভুলে।

আর একটি ছড়ায় বলা হয়েছিল :

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর

দিন দিন যায় বেড়ে,
নিত্য চাউল লাফিয়ে লাফিয়ে
আকাশে বসলো চড়ে
ক্ষুধায় কাতর হ'ল মানুষ
চাউল কেনা দায়,
বিদ্রোহ তখন উঠলো জেগে
মনের কোনে হায় !

সেকালে তারকেশ্বরে মোহন্তের দ্বারা নানা অনাচার চলেছিল। অনাচার বন্ধ করার জন্য এবং মোহন্তকে অপসারিত করার জন্য তারকেশ্বরে আন্দোলন হয়েছিল ; সত্যাগ্রহ সুরু হয়েছিল।

দলে দলে দেশ প্রেমিক যুবকেরা বাংলাদেশের এমন কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে যোগদান করেছিলেন। তারকেশ্বরের মোহন্তকে নিয়ে বটতলা থেকে বহু বই ছাপা হয়েছিল।

তারকেশ্বরের মোহন্তের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা লেখনী ধরেছিলেন। ছোটো ছড়ার কবি ও ছোটো বইয়ের লেখকেরা চটি বই বের করে, পট এঁকে, ছড়া কেটে এবং গান গেয়ে মোহন্তের অনাচারের কথা প্রচার করেছিলেন। মোহন্ত প্রসঙ্গে একটি ছোটো ছড়ার বইতে ছাপা হয়েছিল :

মোহন্তের এ নবাবী কার ধন পেয়ে ?
কি বা তার অধিকার ?
কেন করে অনাচার ?
কেউ ফিরে একবার,
দেখবিনে চেয়ে ?
কি আশ্চর্য্য ? এ ঐশ্বর্য্য যারা কৈল দান,
তাদের সন্তান যারা,
ভুলেও পুছেনা তারা,
পিতৃকীর্ত্তি যায় মারা,
তবু নাই জ্ঞান !
সে কি নয় সমুদয়, দেবোদ্দেশে দান

আতুর অতিথি যাত্রী,
তারাই দানের পাত্রী,
তা না হয়ে দিবারাত্রি,
মহাবুভিমান !
সাধে বকি, দেখ দেখি, দান পত্র খুলি,
ধারা কি তার এমি ধারা,
মোহন্ত হইবে যারা,
সুচি মণ্ড ব্রাণ্ডি মারা,
হবে চুল বুলে ?
লিখেছে কি, যত অর্থ উপস্বত্ব হবে,
মহারাজ কল্‌না গিন্নি,
কর্বে তা' তে বাবুগিরি,
শত সেবাদাসী ঘিরি,
কাছে শুয়ে রবে ।

আর একটি হেটো ছড়ায় বলা হয়েছিল :

দিনে যোগী রাতে ভোগী লম্পট দুর্জন,
ভুলাতে রমণী, বেশ মদনমোহন ।
কোথা বা গেরুয়া কোথা রুদ্রাক্ষের মালা,
চিমটা পড়িয়া কাঁধে বামে শোভে বালা ।
শিরে জটা পাগে ঢাকা ললাটে চন্দন,
সুরা সেবি ঢুল ঢুল আরক্ত নয়ন ।
মিথ্যাবাদী দুরাচার লম্পট বিলাসী,
এরাই এখন ভবে মোহান্ত সন্ন্যাসী ।
ইহাদের অত্যাচারে ভাসিতেছে দেশ,
তীর্থের কলঙ্ক এরা পাষণ্ডের শেষ ।
ধন্য তুমি ধন্য ওহে কলির মোহান্ত,
ধরায় পাপের লীলা দেখালে চূড়ান্ত ।
নন্দন আনন্দ ধামে অভিশপ্ত শনি,
কুসুম-স্তবক মাঝে বিষধর ফণি ।

দেশের নানা সমসাময়িক ঘটনার কথাও হেটো বই হেটো ছড়া থেকে পাওয়া যায় । এই সব বই ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহের কাজেও লাগতে পারে । হেটো ছড়ার বই থেকে বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উপাদানও গ্রহণ করা চলে ।

রং বদলায়/জ্যোৎস্নাময় বসু/চার টাকা

রং বদলায় নাটকটি সম্ভবত নাট্যকার জ্যোৎস্নাময় বসুর প্রথম রচনা-প্রয়াস। কেন না এর আগে এঁর লেখা কোন নাটক পড়েছি বলে মনে হচ্ছে না অথবা মঞ্চস্থ হতেও দেখিনি। তবে প্রথম আত্মপ্রকাশের অবকাশেই তিনি নাট্যামোদীদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন—একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

অনেক নাটকই মঞ্চ সফল হয় কিন্তু সে সব নাটক সর্বক্ষেত্রে সুখ-পাঠ্য হয় না। কোন ভালো নাটক যদি সুখপাঠ্য হয় তবে সেটা একটা বাড়তি লাভ। রং-বদলায় নাটকটি অবশ্যই সুখ-পাঠ্য। তরতরিয়ে এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁচেছে। এটা অবশ্যই আশাকরা যায় যে নাটকটি মঞ্চস্থ হলেও দর্শককে সম্মোহিত করে রাখবে। শ্রীবসুর সেটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় সফলতা।

আজকাল বাংলা ভাষায় খুব বেশী ভালো নাটক লেখা হচ্ছে না। যা লেখা হচ্ছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন বিদেশী ভাষার কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে। সুতরাং মৌলিক নাটকের এখন দারুণ অভাব। জ্যোৎস্নাময়বাবু ভূমিকাতে নিজেই লিখেছেন যে, নাটকটিকে যেন মামুলি সাসপেনস্ কাহিনী হিসেবে না দেখা হয়। সে ক্ষেত্রে নাট্যকারের দাবী সঠিক, কেন না নাটকটি কোন আদপেই সাসপেন্স ড্রামা নয়। একটা জোরালো বক্তব্যকে তিনি নাটকে বিধৃত করতে চেয়েছেন। অবশ্য তিনি অকপটে স্বীকার করছেন যে, বক্তব্যটি তার নিজস্ব নয়—সমারসেট মম্ এর। সেই বক্তব্যকে অবলীলাক্রমে প্রতিষ্ঠা করেছেন নাট্যকার। বক্তব্য নির্বাচনের মধ্যে নিজের সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকে চরিত্র সংখ্যা মাত্র আট। দৃশ্যপট নিয়েও তেমন ঝামেলা নেই। সুতরাং নাটকটি অভিনয় করা অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠী সমূহের পথ সহজ-সাধ্য হবে বলে আশা করা যায়। মমতা রায়-এর চরিত্র আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। তাছাড়া সুরেশ হালদারের চরিত্রটিও বেশ মৌলিক। সকলের ভালো লাগবে।

নাট্যকার এমনি নাটক আরও লিখুন. এটাই আমরা আশা করব।

—শ্যামল সেন

বিগত কয়েক মাসে দেশের সাহিত্য-বিজ্ঞান সঙ্গীত-কলা জগৎ থেকে অনেক কৃতবিদ্য মনীষী অন্তর্ধান করেছেন। এঁরা সবাই পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শনও রেখে গেছেন। তবু অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এসব প্রতিভাধর ব্যক্তির বিয়োগে সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র দরিদ্রতর হলো নিঃসন্দেহ।

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলীর (অর্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিত্র সৃষ্টি ও চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রবীন বলতে আর কেউ রইলেন না।

চলচ্চিত্র শিল্প থেকে চিরবিদায় নিলেন চলচ্চিত্র জগতের প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতরসজ্ঞ পাহাড়ী সান্যাল। জাত-অভিনেতার সংখ্যা ক্রমক্ষীয়মান।

মুষ্টিমেয় ভারতীয় বিজ্ঞানীর মধ্যে বিশ্বখ্যাতি অর্জনের অধিকারী বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরলোক গমনে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলনে ভাঁটা পড়লে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে।

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধনা ও স্বদেশ সেবার জন্য নির্যাতন ভোগ করে এক কালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত অনেক কবিতায় কবির দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি দরদ সুস্পষ্ট।

সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর প্রয়াণে কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষতি পূরণ হবে হয়তো; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দরিদ্র অংশ সমালোচনা সাহিত্য যে দরিদ্রতর হলো তা অনস্বীকার্য। ধারালো গদ্য লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য।

বাংলা সাহিত্যের গোমড়া মুখে যিনি আচমকা হাসির জোয়ার এনেছিলেন রম্য রচনার স্রষ্টা সেই সৈয়দ মুজতবা আলীর মৃত্যুতে দেশবিদেশের ভাষা সাহিত্য থেকে নিত্য নূতন রূপকালঙ্কার প্রবাদ প্রবচণ আহরণ করে বাংলা ভাষাকে সাজাতে আর কেহ আপাততঃ নেই।

বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ আমীর খাঁর অকালে মর্মন্তুদ মৃত্যু সঙ্গীত রসিক মাত্রকেই ব্যথাতুর করেছে।

শুধু সাহিত্য নয় সাহিত্যিক-স্রষ্টা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও গত হলেন। মৌলিক সাহিত্য স্রষ্টা হিসেবে না হোক অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যের মধুভাণ্ড তিনিই বাঙ্গালী পাঠকের কাছে পরিবেশন করে পাঠকদের দৃষ্টি, কল্পনা ও ভাবনার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। অনেক অপরিচিত সাহিত্যিককে তিনি হাতে ধরে সাহিত্যের অঙ্গনে তুলে এনে তাঁদের খ্যাতিলাভের ভিত পাকা করে দিয়েছেন যা আজকের দিনে ভাবাও যায় না।

খ্যাতনামা ভাস্কর চিত্রশিল্পী, এবং লক্ষ্ণৌ স্কুল অফ্ আর্টসের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুধীর খাস্তগীর মহাশয়ের মৃত্যু চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পীকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

কৃশানু

একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।
প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য একটাকা
এককালীন চাঁদা পাঁচ টাকা।
বিশেষ সংখ্যার বর্ধিত মূল্য গ্রাহকদের দিতে হয় না
নমুনা সংখ্যার জন্য দশ পয়সার দশখানা টিকিট পাঠাতে হবে
পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না
এজেন্টরা ২৫% কমিশন পাবেন
ডাক ব্যয় পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বহন করবেন
কৃশানু মুখ্যত নবীন লেখকদের মুখপত্র
উন্নত মানের যে কোন মৌলিক রচনা প্রকাশের জন্য সাদরে গৃহীত হবে
উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ সম্ভব নয়

—কর্মাধ্যক্ষ

দুর্মদ জাহানকোষা আজ অতীতের স্মৃতি

জাহানকোষা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেরা হাতিয়ার। আজ অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র। অতীতের মুর্শিদাবাদ—ঐশ্বর্য আর বিলাসের লীলাভূমি। যেখানে অতুলনীয় দেশপ্রেম আর স্বর্গতুল্য ষড়যন্ত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে সমান গতিতে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র স্মৃতিসৌধ, যা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে নবাবী বাঙলার গৌরব-গাঁথা আর তার পতনের বেদনাময় ইতিহাস। এছাড়াও আজকের মুর্শিদাবাদে আপনি পাবেন অতীত ঐতিহ্যের স্মারক সূক্ষ্ম কারুকার্যে অলঙ্কৃত রাজির হাতের জিনিস পত্র আর সিল্কের শাড়ি। আসুন চলুন মুর্শিদাবাদ। দেখে নিন নবাবী আমলের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি। রাত্রিবাসের জন্যে রয়েছে বহুমধ্যপূর্ণ ট্যুরিস্ট লজ। সেখানে পাবেন আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম।

বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ
(ডালহৌসি স্কোয়ার) ইষ্ট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৬২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ন দত্ত কর্তৃক জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স, ৫৯/২ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত
১৩ কলেজ রো, কলি-৯ থেকে প্রকাশিত।

কৃশানু

অন্ধজনে দেহ আলো

- চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে অন্ধত্ব দূর করা আজ আর কঠিন কাজ নয়। চক্ষুষ্মান কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর চোখ তুলে নিয়ে সেই চোখের কর্নিয়া যদি কোনো অন্ধের চোখে লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

- চোখ এমনভাবে তোলা হয় যাতে মৃতের মুখ-মণ্ডলের কোনো বিকৃতিই ঘটে না।

- দেশের লক্ষ লক্ষ অন্ধজনের কথা ভেবে আপনিও আপনার চোখ দান করে যেতে পারেন। আপনার সেই মহৎ দানে একজন অন্ধ নবজন্ম লাভ করবে, দেখতে পাবে পৃথিবীর আলো।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের

আই ব্যাংকের

স্বেচ্ছাকৃত চক্ষুদাতার তালিকায়
আজই আপনার নাম তালিকাভুক্ত করুন
আই ব্যাংক দিবারাত্র খোলা থাকে
(ফোন : ৩৪-৯২৫২)

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ২১১৮/৭৪

সদ্য প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ—

সুর দাসের—

✪ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে ৮·০০

সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংস্থাগুলির কাজ-কারবার এবং সমস্যাবলী সম্পর্কে বাংলা প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

✪ পলাশের রঙ ৪·০০

শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত
এগারজন তরুণ গল্পকারের গল্প সংকলন

✪ সময়ের কণ্ঠস্বর ৫·০০

মদন দাশ, প্রভাসকান্তি ভদ্র, রত্নেশ্বর বর্মণের গ্রন্থ

✪ গল্প ৫·০০

দশজন তরুণ গল্পকারের গল্প সংকলন

✪ গল্প দশক ৩·০০

নারী ভূমিকা বর্জিত হাসির নাটক

✪ লাভার্স লেন ৩·২৫

মদন দাশ ও প্রশান্ত রায় এর কাব্যগ্রন্থ

✪ বেঁচে থাকা দু'জনের ৩·০০

লিপিকা

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৩০।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

কৃশানু

মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক
ষষ্ঠ বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা
১৩৮০-৮১

কবিতাকে ছাড়া মানুষ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে, করতে পারে – কিছু যায় আসে না। অথচ মানুষের সুখ-দুঃখ ইত্যাদি জীবন্ত অনুভূতিগুলো থেকেই জন্ম নেয় কবিতা, যেহেতু কবিরা অ-মানুষ নন।

অনেক সময়, কবিতা প্রাণবতী—অর্থাৎ চরম ভাবে গঠিতা হয়ে উঠলে, তার স্রষ্টা স্বয়ং কবি পর্যন্ত শঙ্কিত হন সামান্য কোনো শব্দ পরিবর্তনের ব্যাপারে। এ সংকলনে সে-রকম কিছু ভালো কবিতা আছে, যারা 'সম্পাদকীয়'-র তোয়াক্কা করে না।

এ জন্য সম্পাদক অ-খুশী নন। কেননা একমাত্র কবিতাই তার প্রাপ্ত সব রকম অবহেলাকে খুব সাবলীল ভাবে অবহেলা করে বিশ্ব সাহিত্যের প্রথম সারিতে পৌঁছেচে।

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র সিংহ

সূ চী প ত্র

বিষ্ণু দে ॥ স্বপ্নেই আরোগ্য আজ ॥ পাঁচ
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ॥ যন্ত্রণা ॥ ছয়
উমা দেবী ॥ তাকে চাই ॥ সাত
কৃষ্ণ ধর ॥ এবং চূড়ায় গিয়ে থামা ॥ নয়
তরুণ সান্যাল ॥ মুক্তি না-কি ॥ দশ
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ॥ সে কিন্তু দুর্বল ভালো ॥ এগারো
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ নিজের আড়ালে ॥ বারো
অমিতাভ দাশগুপ্ত ॥ লুণ্ঠন লুণ্ঠন ॥ তেরো
তারাপদ রায় ॥ তোমাকে না দেখার দুঃখ ॥ চোদ্দ
দিবেন্দু পালিত ॥ শুধু খেলা ॥ পনের
শান্তিকুমার ঘোষ ॥ উঠে আসছেন তিনি ॥ ষোল
তুষার রায় ॥ সেখানেই জয় ॥ সতের
দীপেন রায় ॥ বিরহের গান ॥ আঠারো
প্রভাস ভদ্র ॥ এ সময় ॥ উনিশ
গোবিন্দ ভট্টাচার্য ॥ বাসনা দুরন্ত ফুল ॥ কুড়ি
কানাই ঘোষ ॥ আমি সত্তাকে ॥ একুশ ॥
রাণা বসু ॥ অলস মায়া ॥ বাইশ
দেবাশিস বসু ॥ কিংবা কবিতা ॥ তেইশ
পিনাকীরঞ্জন গুহ ॥ নিঃশর্তের গোলাপ ॥ চব্বিশ
প্রদীপ চক্রবর্তী ॥ বৈশাখ দিনের গান ॥ পঁচিশ
গোপাল ভট্টাচার্য ॥ অশৃঙ্খল অভ্যেস হয়ে গেছে ॥ সাতাশ
প্রশান্ত রায় ॥ অসুখ ॥ আঠাশ
ধ্রুব বসু ॥ হাসপাতালের বিছানায় আমি ॥ তিরিশ
মদন দাশ ॥ ব্যথা ॥ বত্রিশ

স্বপ্নেই আরোগ্য আজ

স্বপ্নেই আরোগ্য আজ, আরাম, আনন্দ, শান্তি।
তাই উত্তীর্ণ জ্যোৎস্নায় স্থির ধীর নীলিমায়
শুষ্ক হেমন্ত হাওয়ায় ক্লান্তিলগ্ন হৃদয়েরা চায়
স্বপ্নের স্ববশ যুক্তি
মানসের মুক্ত সাঙ্গীতিক কড়িকোমলের এক নব্যন্যায়ে
অতিকায় কুবের কবন্ধ বাস্তবের রূপান্তরে
পুনর্নির্মাণের স্বাধীন বিন্যাসে নিয়ন্ত্রিত স্বকীয় সীমায়

খেদ শুধু এই ; কেন জীবন-মরণ মানা স্বপ্নের অভ্যাসে
থেকে থেকে আসে দুঃস্বপ্ন এবং
ঘুম ভেঙে যায়, প্রায় মৃত্যুতে অসাড়
সমস্ত শরীর এমন কি স্বয়ং চৈতন্য রুদ্ধশ্বাস
না-জীবন-না-মরণ অন্ধ শূন্যের ভয়াল নাগপাশে ।।

বিষ্ণু দে

যন্ত্রণা

মাথার মধ্যে দারুণ এক যন্ত্রণা,
অথচ এরকম যন্ত্রণা আমার কখনো ছিল না ।
বুকের মধ্যে কোথাও
শোণিত প্রবাহের ভেতর
ছড়িয়ে পড়ছে এই যন্ত্রণা,
আর সঙ্গে সঙ্গে যেন নিমেষেই
আমার চোখের সামনে সমগ্র নিসর্গের ভেতর
ঝাপসা হয়ে আসছে দৃশ্যগুলো,
মনে হয়
আর একটু বাদেই সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

না আমি মরছি না, অন্ধও নই ;
আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্নায়ুগুলোও
মোটামুটি সুস্থ ;
আসলে আমার শরীরের রক্ত চলাচলে
এখন ছড়িয়ে আছে দারুণ কাপুরুষতা,
সময়ের চাকায় লাগছে নিত্য নতুন ঘটনার রক্তের দাগ,
আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছি……
আর ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে দুর্বিসহ যন্ত্রণা ।।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তাকে চাই

আমি তাকে চাই।
আমার অস্তিত্ব তাকে ঘিরে
যদিও হয় না আবর্তিত।
আমি এক শূন্যমনা বিভ্রান্ত আত্মার
বিচ্ছিন্ন প্রকাশ নই।
তাই
তাকে পেতে চাই
দু'বাহুর মধ্যে নয়,
চক্ষের সম্মুখে নয়,
কর্মের প্রাঙ্গণে নয়,
নয়—নয় সংস্কৃতি উৎসবে।
কোথায়—কখন তবে?
নিজেই জানিনা ঠিক।

সময় হারিয়ে যায়
বাসনা মিলিয়ে যায়
সুখ কিংবা হঠাৎ ব্যথায়
কোথাও পাইনা তাকে।
তবু তাকে চাই
যেন রক্তকণিকার মধ্যে সেও
দুষ্ট রোগবীজ হয়ে ঘোরে।
কিংবা কোনো গুপ্ত কিংবা সুপ্ত বীজ—মাটিতে লুকোনো।

কোনো কোনো দিন
সেই বীজ হয়ে ওঠে মুহূর্তেই প্রত্যক্ষ প্রবীন।
পাতা ধরে—ফুল হয়—ফল হয়—পাখীরাও আসে,
দু' একটি পাতা কিংবা দু' একটি পাপড়িকে খসায় বাতাসে।
মায়াতরু ভেঙে পড়ে নানা ছাঁদে আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে।
তারি তাপটুকু পাই।

পেয়ে খুশি থাকি।
তার বেশি যদি কিছু চাই
কম্পিত অঙ্গুলি থেকে খসে পড়ে ইচ্ছার ইশারা
ভীরু প্রাণ দিশাহারা
অতলেই নোঙর নামায়
তবু তাকে চায়!

উমা দেবী

এবং চূড়ায় গিয়ে থামা

আজও মিছিল ছিল পতাকায়
পতাকায় ছিল অরণ্যের বিস্তারিত
গভীরতা মিল।
পায়ে পায়ে হাঁটা হাতে হাতে
যেন লক্ষ লক্ষ কচি শাখা
আন্দোলিত হাওয়ার দোলায়।
এবং সহস্র চোখ জোড়া জোড়া
যতদূর দেখা যায় জ্বল জ্বল
তারকার ছায়া।
আকাশে মাটিতে পথে ঘরে
ঘরে প্রসারিত অলিন্দে
নিচু হয়ে আসা শত মুখ।
কৌতূহল অবারিত অনিবার্য
ধ্বনি শুধু ফেরে মুখে মুখে
পতাকায় পতাকায় মিল।
তার সঙ্গে মনে মনে জুড়ে দিই
আরও ছবি, ধুলো পড়া
বিস্মৃতির আবরণ মুছে।
চোখের সামনেই ভাসে আরও বহু
মুখ, চলেছিল এই পথে
একই ভাবে বহুবার একই কথা বলে।
সবাই একত্র আজ সকলেরই বুকে
একই আশা স্পন্দমান
চড়াই উৎরাই ওঠানামা।
সামনে পাহাড়, নদী, দূরন্ত সাগর
একাকার মিশে মোহানায়
এবং চূড়ায় গিয়ে থামা।

কৃষ্ণ ধর

মুক্তি না-কি

তুমি যাকে চাও সে-কি মাঠের বাদামি মাটি, ঘাস
নাকি অন্যকিছু,
এই রক্ত হাড় মাংস মিশে কাদা ?
তুমি কাকে চাও সে-কি না-সুখ না-অসুখ, উচ্ছ্বাস
নাকি অন্য কিছু
এই দুঃখিত মুখের চক্রধাঁধা ?
চলে যাচ্ছি, হে রমণী, চলে যাচ্ছি তোমারই মাটিতে
ঘুমে, স্বপ্নজাগরণে, ঘুমে কাঠকয়লায় আগুনে,
মৃত্যু ও মুক্তির স্বাদ এক নয়
কিন্তু তারা সফল আঁটিতে
মুক্তি দীর্ঘ শস্যশীষ
মৃত্যু ঘের বাঁধা খড়, চিটে বুনে, সকৃতজ্ঞ হুনে !
আলোও নিশ্চয় জ্বালা, কিন্তু আলো, আলো ছাড়া অস্তিত্ব কোথায়
এবং মুক্তির নাম তীব্র শিখা, মৃত্যু তারই আঁধার পিলসুজ
এসব আমার কোনো আবিষ্কার নয়, এরা ঢের পুরাতন
কেবল নতুন করে মনে পড়লে বুক ভরে যায়
মনের দুঃখিত মাঠে
প্রথম বৃষ্টিতে হলদে ঘোমটা খুলে
শিউরোয় সবুজ
তুমি কাকে চাও নারী
বসুন্ধরা ? সিংহাসন ?
নাকি মহাশূন্যে এই জীর্ণ পৃথিবীর ভেলা বেয়ে যাওয়া
ছলছল মৃত্যুর দাঁতে
খেলা খেলা মৃত্যু না জীবন ?

তরুণ সান্যাল

সে কিছু দুর্বল, ভালো

মানুষের ভিতরের রক্ত তাকে পাগল করেছে
দাঁড়িয়ে রয়েছে এসে, অন্ধকারে, গলির আঁধারে—
হাতে খরশান জিহ্বা ইস্পাতের, কঠিন দাঁতের
তাতে কিছু সমাপ্তির চিহ্ন এসে ধরা দিতে চায় !

আমিও মানুষ, হাতে কিছু নেই—করতলে রেখা
আছে হিজিবিজি ভাগ্য, উড়ে যায়, উড়ে-পুড়ে যায়
কিন্তু, তা কখনো ছুটে মানুষকে আঘাত করেনা—
সে কিছু দুর্বল, ভালো, কিছুটা মানুষে মায়াবাদী ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নিজের আড়ালে

সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে
সে খোঁজে ভ্রমর কিংবা
দিগন্তের মেঘের সংসার
আবার বিরক্ত হয়
কতকাল দেখেনা আকাশ
কতকাল নদী বা ঝর্ণায় আর
দেখে না নিজের মুখ
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে।

নারীর রূপের ফাঁদে
বার বার হয়েছে কাঙাল
যেমন বাতাসে থাকে সুগন্ধের ঋণ
অযুত বর্ষের স্মৃতি আবার কখন মুছে যায়
অসম্ভব অভিমানে খুন করে পরমা নারীকে
অথচ সে অস্ত্র তোলে নিজেরই বুকের দিকে
প্রকৃতিকে চিনেও চেনে না
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লুণ্ঠন লুণ্ঠন

বিষ হয়ে ওঠে ওষ্ঠ।
অপেক্ষায়। প্রার্থনায়। স্তবে।
কে আছে নিখিলে
পারে, সব মুছে দিতে পারে ?
ধাতব হত্যার শব্দ বেজে ওঠে পাহাড়ে, পাহাড়ে।

ট্রিগারে তর্জনি লেগে ছুটে গেলে অমোঘ নিয়তি
পুড়ে গেলে দু চোখের দ্যুতি
ম ম গন্ধে ভেঙে আসে শোণিতের দিন—
মানুষের হাতে তবু ঘুরে যায় ড্রিলিং মেশিন।

একে একে সবক'টি নক্ষত্র লুণ্ঠন করে মেঘ।
যা কিছু আবেগ
এক লহমায় দূরে, ঈশানে, নৈঋতে একাকার ;
তমোঘ্ন কুমার
মরীয়া দক্ষিণ হাতে তুলে ধরে ছুরি,
ঝটিকা-সম্ভোগে কাঁপে ঝি ঝি
দীর্ঘ শালবন—
সব নিবেদন শেষ। বাকি শুধু লুণ্ঠন, লুণ্ঠন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

তোমাকে না দেখার দুঃখ

বহুদিন হ'লো তোমায় দেখা পাইনা।
এ কথার মানে এই নয় যে,
তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয়,
বা তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা রয়ে গেছে।

আসলে বহুদিন তোমায় দেখা পাইনা ;
যেমন বহুদিন শিলাবৃষ্টি হয়নি,
যেমন বহুদিন ঝর্ণা দেখিনি,
বহুদিন কোনো নদীর স্রোতে সাঁতার কাটিনি।
অনেকটা সেই রকম,
বেদনা ও মমতা বোধহীন
তোমাকে না দেখার দুঃখ
সম্পর্ক ও যোগাযোগহীন তোমার স্মৃতি।

বহুদিন হলো তোমায় দেখা পাইনা।

তারাপদ রায়

শুধু দেখা

শীতের দিনেও কিছু অবসরের দরকার
নিছক ঘাম শুকোবার জন্য।
হাঁটুতে জোর থাকলেও
দরকার ক্রাচের—
যার উপর ভর করে
টিকুতে টিকুতে
অব্যবহিত স্মৃতির পথ
অনায়াসে পেরুনো যায়।

ক্ষত না হলেও
চামড়ায় পিন ফুটনো দরকার—
শুধু দেখা—
রণ বিজয়ের মতো রক্ত
আছে কি নেই।

দিব্যেন্দু পালিত

উঠে আসছেন তিনি

ছেলেবেলায় ঘুম ভাঙলে দেখতাম জলে-ধোওয়া আলোয় ঘর গিয়েছে ভরে
নদীর ঠিক শিয়রে খাড়া পাহাড়
মনে মনে ভেবেছি জমে থাকা দুধের ফেনার মতো মেঘ ছাড়িয়ে
তিনি বসেছেন স্ফটিক আসনে
ছুটে যেতাম পথ করে নিয়ে
মধুগন্ধী ঘাস, ঘাস-ফুল ফেলে···পাদভূমির অরণ্যে
সূর্যহীন অন্ধকার আক্রমণ করেছে আমাকে
বুনো পাখীর চঞ্চু বিক্ষত করতো বাহু
দুলতে থাকতাম আশায়
কত উপরে চলে গাকদণ্ডী, তার দু'ধারে তুলসীর বন, কুসুম উপত্যকা
হেমকুণ্ডে বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো স্নান
অমরতা

আজ দেয়াল জোড়া আয়নায় তাকিয়ে দেখি
মুখ রয়েছে বেঁকে, চোখ গিয়েছে বসে
তুলে-ধরা হাতের অনামিকায় শুকিয়ে এসেছে প্রেম
কখন মধ্যম থেকে খসে পড়েছে অঙ্গুরীয়
আমি প্রাসাদ ছেড়ে নেমে এসেছি কারাভ্যানে
আমাকে সুদ্ধ ক্যারাভ্যান কি উড়িয়ে নিয়ে যাবে
বড়ো সমুদ্রের মুখে···
চিতার জলন্ত আঙার ঝরছে সেই জলে
পাপ ধুয়ে যাচ্ছে স্রোতে
আর অন্ধকার ঢেউয়ের মাথায় আলো দুলিয়ে
গভীর থেকে উঠে আসছেন তিনি
মকর বাহনে

শান্তিকুমার ঘোষ

সেখানেই জয়

এই দেশ তোমাকে গভীরে ভালোবাসি
এই জল হাওয়া ও খাদ্য
রক্তের ভিতরে খেলা করে
নিশিদিন।
প্রেম তুমি ক'রকম খেলা জানো
জানো ইতিহাস
ভূগোলের প্রতিটি ব্যাপার?
তারপর কি বিচিত্র মানুষের
প্রগাঢ় মিছিলে

তুমি কোথা ছিলে, কোনখানে
তবু তুমি জেনে রেখো
এই প্রেম একবারই হয়
এই বিস্ময় এই সৃজন ক্ষমতা
যদি কাজে লাগে; মানুষের
সেখানেই জয়।

তুষার রায়

বিরহের গান

আধলা হয়ে পড়ে আছি দুজন দুদিকে
মাঝে মাঝে ঘুমে স্বপ্ন ধুয়ে যায়
জাগরণ আমাদের হোলনা তবুও।
লাঙলের থেকে শুধু খসে পড়ে জংধরা মাটি,
শ্রাবণ তো চলে গেলো সামনে পচা ভাদ্দরের ভর,
ঝাঁ ঝাঁ রোদ চামড়া পুড়ে বাজ পড়া কালো,
ঘোড়ার দৌড় দেখতে যেতে পারো এবার ঝুলনে!
আষার কবে যে আসবে কবে নামবে ঝড়
শ্রাবণ তো চলে গেলো ভাদ্দরে কি রোয়া হবে ধান!
এদিকে শরৎকাল পা রেখেছে শিউলির ডালে।

আমাদের পরমায়ু গরুর বাঁটে মাপা দুধ
ভোর থেকে দোয়াচ্ছে গোয়ালা. এখন দুপুর
মাথার ওপরে চাই ঘর কিংবা দোর
আনালা না হোক একটু বিশ্রাম অন্তত।

দীপেন রায়

এসময়

তুমি আমি সে—সকলেই ভালো।
অথচ নিয়ত
প্রিয় পরিচিত মৃত্যুশোক
কান্না জমে রাশিকৃত বরফ হলো
রক্তক্ষয়
দন্ত দুপুরের বিষণ্ণ ব্যথা
অনেকের অহংকার···
এসময় ভালবাসার ভীষণ দরকার।

ছায়া কায়া নিঃশ্বাসে অবিশ্বাস
দ্বন্দ্ব :
অরণ্যরীতি ছাড়ো।
সম্পর্কিত প্রাণের প্রীতি এখন স্মৃতি
নিঃসঙ্গ শূন্যমন
তোমার আমার
এসময় ভালবাসার ভীষণ দরকার।

প্রভাসকান্তি ভদ্র

বাসনা দুরন্ত ফুল

বাসনা দুরন্ত ফুল
কপট স্নিগ্ধতা আর বিষণ্ণ প্রণয়
একদিকে রৌদ্রময় অন্ধকার
অন্যদিকে অন্ধকার আলোয় উজ্জ্বল।

রঙ মানে সূর্যালোক
রঙ তবু প্রিয়তর
ভালো লাগে তাই ভালোবাসা
কে বোঝে ফুলের অর্থ উন্মুখ কৈশোরে!

দুহাতে কুড়িয়ে স্বপ্ন তবেই দুপুর
রৌদ্র তার শেষ কথা নয়
পাদদেশে ছায়ার ঝিল্লীরা
তাই উজ্জ্বল আলোর বৃত্ত পাপড়িতে পাপড়িতে।

বাসনা দুরন্ত ফুল
কল্লোলিত ভোর আর
সমাহিত প্রদীপ্ত দুপুর

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আমি / সত্ত্বাকে

এখন সমস্ত মন দৌরাত্ম্যে মুখর।
অথচ একাকী আমি যুগন্ধর
পুরুষের মত কথা বলি।
বিপ্রলব্ধ এ কৌতুকী। কোথাও আশ্রয় নেই তাই চলি।
শতমুখে বৈশ্বানর। চতুর্দিকে উন্মাদ পৃথিবী সংহত।
সব জানি; তবু, সেই যোগারূঢ় মানুষের মত
এ হিংসা ঘৃণা করি।
দয়া প্রেম সৌজন্য, —কিছুই না,
এখন কিছুই আর অবিরল নয়। এই যে যন্ত্রণা,
নিরবধি সহস্র মৃত্যুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এই যে জীবিত থাকা
এবং অসংখ্য ক্ষত বুকে নিয়ে—আনন্দের ভস্মগায়ে মাখা
কী বিপুল হাস্যকর।
আমার চেতনা জুড়ে কি অসহ্য কলরবে কাঁপে ঘর।
কম্পিত সমস্ত দিন—অরুণিম দিন
দৃপ্তত দৌরাত্ম্য করি। অন্তরে অশোধ্য ঋণ
'অমৃতের বংশধর'
সেই মধু, সেই মন্ত্র, সেই বর।
জমে জমে পর্বত হয়েছে, এতদিনে।
এবং আমাকে শুধু পথ চিনে চিনে
সকলের ঘরে যেতে হবে, দেখে নিতে
অমৃতের ঋণ শোধ দিতে
কত বাকী আছে আর।
এই সব দেবতার।
অথবা আমার আমাদের সরকার।

কানাই ঘোষ

অলস মায়া

স্মৃতির দরজা ঠেলে
কেন তুমি মাঝে মাঝে উঁকি মারো
বুঝি না কিছুতে—
নিহত গোলাপ তুমি
ইতস্তত পাপড়িগুলো ছড়ানো ছিটানো
ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছা করে নাকো।
তবে কেন
দর্পণে বিম্বিত হয়,
উত্তাল সমুদ্র তো
তোলপাড় ঢেউ তুলে নিশ্চল নিস্তেজ।

সবুজ ঘাসের বুকে
একদা যে শ্যামলিমা জন্ম নিয়েছিল
সে তো আজ বিবর্ণ অচল।
অপরাহ্নে ঢলে পড়া সূর্যের আভায়
চাই না, চাই না ফিরে
মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত আলো-কে।

রাণা বসু

কিংবা কবিতা

সমস্ত শহর জুড়ে তুমি শুধু হাঁটো—হেঁটে যাও
দেখে এসো দক্ষিণের জানলাগুলো সব ঠিকঠাক
খোলা কিনা,
কতখানি পরিসর ঘরের, সেখানে হাওয়ার চলাচল
কীরকম ;
কেউ ডাকবেনা জানি তবু তুমি যাও ঘোরোফেরো
বাগানে বাগানে, নতজানু হয়ে জল ঢালো
প্রতিটি গাছের পায়ে
একটি কুঁড়িও যেন অবেলায় মাটিতে না ঝরে
এই কথা গৃহস্থকে বলো ;
সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত খুব
তবু তুমি যাও
সবখানে রেখে এসো তোমার হাতের ছোঁয়া
কিংবা কবিতা ॥

দেবাশিস বসু

নিঃশর্তের গোলাপ

আমায় তুমি উলের কাঁটায়—
অলস বেলায় বুনছো কেবল ;
উষ্ণতাকে এমনতর গনতে গিয়ে—
কাঁটায় হিসেব গুণতে গিয়ে,
শুনছো যেন অনেক কিছু,
শুনছো যেন এর ফলাফল।

বুকের কাছে নরম জমি উঠছে ভিজে,
কী যে করো, কেইবা বোঝে !
কেইবা খোঁজে উলের কাঁটায়
তোমার নিষ্ঠা, তোমার হৃদয়।

রঙ বেরঙের এই যে খেলা,
কাটিয়ে বেলা দু'টি কাঁটার কুশলতায়,
মন-চোঁয়ানো রক্ত-বিন্দু,
ফুটিয়ে দিচ্ছে রক্ত-গোলাপ ;
প্রাণের আলাপ শুনছে কী কেউ !

আহা ! কেউ কী জানে,
কোন্ কাঁটাকে পেরিয়ে গেলে—
সত্যিকারের গোলাপ মেলে !

পিনাকীরঞ্জন গুহ

বৈশাখ দিনের গান

বেলীফুলের মালা জড়িয়ে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকে
সবুজ যুবতীরা
তাদের চেনা শরীরে নিওনের আলো ঠিকরে পড়ে
ভিজে যায় ঘামের পালঙ্ক
মসৃণ বাতাস আসে দক্ষিণ থেকে
কেনেস্তারা পিটিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে ওরা চলে যায়
গ্রামে
পান্তাভাতের ভেতর গজিয়ে ওঠে অক্ষয় পরিতৃপ্তি
বেসুরো বাঁশি বেজেই চলে বহুদূর থেকে
কেঁদে ওঠে বেড়াল গভীর অসুখে
সবুজ যুবতীরা বাড়ি ফেরে গুন গুন গান
গেয়ে

শিতলপাটিতে পা বিছিয়ে সিসীমার রাজ্যের কাব্যি
বিধবার ন্যূনতম কোন অভিযোগ নেই
ঝুলবারান্দায় গড়িয়ে যায় গরম হাওয়া
কৃত্রিম বরণে দুলে যায় যুবক-যুবতীরা
তাদের সুন্দর মুখে ফুটে ওঠে বৈশাখের গান
হেঁকে যায় "আইসক্রিম কুলপি ইত্যাদি"
মোড়ে মোড়ে জনতার সংসার আলোচনা
তাদের মুখ থেকে গলে পড়ে স্নো পাউডার যাবতীয়
প্রলেপ
দরজায় দরজায় ঠোকাঠুকি হয় বৈশাখের মাতলামিতে
চড়া রোদে একদিন সব শপথবাক্য ঝুঁকে পড়ে
সবুজ যুবতীরা চলে আসে বধ্যভূমিতে—নিওনের
আলোতে কারও মুখ চেনা যায়না
চেনা গলির সব দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে পুলিস
জটিল পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ওরাই নির্দিষ্ট

এইভাবে একটা একটা বৈশাখের পরিচিত দিন কেটে যায়

আর তোমার পাণ্ডুর চোখে ফুটে ওঠে
গ্রাম্যতা দোষ আরও
এইভাবে আমি কিছুকাল খারাপ থাকব
মাঝরাতে আমার বিরাট হাতদুটো
তোমার ব্যথার শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে
এবং পল্লবিত হবে
তিতিক্ষা গোপনে।

প্রদীপ চক্রবর্তী

অ-শৃঙ্খলা অভ্যেস হয়ে গেছে

শুধু যন্ত্রণাক্ত হলেই অ-শৃঙ্খলা
নিশীথে সরীসৃপের মতো অযোগ্যতা
স্খলন পতন ইত্যাদি
যা কিছু বর্তমান সব

অ-শৃঙ্খলাবোধ এইরকম বিদ্রোহের কারণ
যৌবন। এতোদিন ধরে ছিলাম কীটদষ্ট
দ্রাক্ষার ভেতরে

অল্পবয়েস থেকেই পথ অনেক দীর্ঘ কবিতা পড়া
আর একা একা শৃঙ্খলা বলতে
সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে
হারিয়ে যাওয়া

অথচ যে রাস্তাটা দিয়ে চলতে
উদ্যোগী হয়েছিলে
তা কতটুকু দূরে
কোথায় তার শেষ পদচিহ্ন

কে যেন বললো আমরা কোনো অপরাধ করেছি
কে যেন বললো অ-শৃঙ্খলা অভ্যেস হয়ে গেছে।

গোপাল ভট্টাচার্য

অসুখ

॥ ১ ॥

"মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা একা একা
যেখানে সেখানে যাই···দেখি :
সবাই আমার চেয়ে ঢের সুখে···
ইচ্ছে হয় : কলকাতার আকাশে বাড়িয়ে হাত
নখের আঁচড় মারি—চুলসে যাক্—
যার নাম চাঁদ
সেই উজবুক রুপোলী বেলুন
অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে মিশে গেলে
বেঁচে যাই

॥ ২ ॥

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যা-রাতে
পরম বন্ধুর ঘরে উচ্ছ্বসিত আলো আনন্দ-সভায়
বহুকাল পরে প্রিয় মানুষের ঘ্রাণে একাকার...
যেন দীর্ঘ অসুখের পর
পান্‌সে-জিভে সুগন্ধি এলাচ
এবং আমাকে বেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলো
পাশের বাগানে ফোটা নতুন কিশোরী
ভীরু রজনীগন্ধার
আপ্তদূতী—হাওয়া
এমন সময়
বলিষ্ঠ ঘোড়ার মতো জনৈক আমন্ত্রিত শ্লথ হয়ে
পড়ে গালিচায়
মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম...

'কী হয়েছে ?' 'কী হয়েছে ?' ব্যস্ত হয়ে কে যেন বললেন :
'এটা হয় ঘুমের অভাবে—'
সরিয়ে সবার হাত, সে লোকটা
হঠাৎ আমার দিকে বাড়ায় আঙুল—বলে :
'আমাকে বেজায় কাবু করে ফেলেছে
শালা—
তোমার মুখের উজ্জ্বলতা।'

প্রশান্ত রায়

হাসপাতালের বিছানায় আমি

প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে বলি,
"হে হিপোক্রিনের ঝরণা—
আমাকে জীর্ণতার হাত থেকে বাঁচাও!"
মৃণ্ময়ী রমণীর সামনে নতজানু হয়ে বলি—
"হে রমণী,
আমাকে স্থবির নৈঃশব্দ্যের হাত থেকে বাঁচাও!"
বিদেহী সংগ্রামীর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ করপুট বাড়িয়ে বলি—
"হে বীর, আমাকে কফিনের অন্ধকার থেকে বাঁচাও!"

কে বাঁচাবে আমাকে?
কে বাঁচায় নিজেকে
এ মড়কের দেশে প্রবাসী অভিকর্ষের নিয়মে
দিনে দিনে দ্বিধাজীর্ণ হতে থাকে শিল্পের অস্তিত্ব
অথবা অস্তিত্বের শিল্প
সে যেন কাগজের ভ্রূণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে
শীতল বাতাসে।

এক রমণী—হিমশৃঙ্গের মত উদ্ভাসিত যার শরীর—
আমাকে বলেছিলো—
"আমরা আলোকবর্ষ পার হয়ে যাব ঈশ্বরের বাগানে
আমরা ভ্রমর হয়ে ফুটব,
আমরা বাতাস হয়ে প্রোথিত হব।"

এক সংগ্রামী
আমার কাঁধে রেখে হাত, বলেছিলো—
"বলো ভাই, মুক্তির লড়াই জিন্দাবাদ।
ঐ দেখো বিপ্লবের পথ,
আর এই নাও শাবল।
চলো সামনে—হেই হেট! হেই হেট!"

যে অগ্নিবর্ণ ঘোড়া —
ঐশী প্রত্যয়ে ছুটে গেল
গভীর রাতের কড়া নাড়িয়ে দিয়ে,
যে রামধনু রঙের ঘোড়া—
বুকের পদ্ম ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়,
তারা কেউ আমাকে সওয়ারী করে না।

আমার ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে যায় বলে
অথবা সময় তাদের চোরাগোপ্তা ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে
আমার অস্তিত্ব, আমার ভালবাসা
টুকরো কাগজের মত ছড়িয়ে পড়ে
শীতল বাতাসে।

ধ্রুব বসু

ব্যথা

এক একদিন সকালবেলা মনে পড়ে যায়
অনেকদিন সূর্য ওঠা দেখিনি
ঠিক তখন মনের মধ্যে ফুঁপিয়ে ওঠে
কেমন এক ব্যথা
সম্ভবতঃ রসকাটা খেজুর গাছের বুকে
যেরকম অসহায় ব্যথা জন্ম নেয়

মাঝে মাঝে পুরোপুরি সভ্য মানুষের মতো
ট্রেনের টিকিট কেটে ছুটি নিয়ে
দিনকণ বাঁধাবাঁধি করে
সমুদ্রের ধার কিংবা পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে উঠি
গম্ভীর বিজ্ঞ হয়ে সিগারেট ধরিয়ে
শিকারীর মতো কটকটে চোখে
চেয়ে থাকি স্লেটের মতো আকাশে
কখন ঝুপ করে সূর্য উঠবে লাফিয়ে
তাক করি ক্যামেরায়—ক্লিক্ ক্লিক্, মনে মনে বলি
ওহে ইচ্ছার দাপট এবার শান্ত হও

তথাপি...
কেরার বেলায়...
মনের মধ্যে ফুঁপিয়ে ওঠে
সেই এক ব্যথা...
সম্ভবতঃ রসকাটা খেজুর গাছের বুকে
যেরকম অসহায় ব্যথা জন্ম নেয়।

মদন দাশ

KRISHANU/Quarterly Vol. VI : No. IV Regd. No. RN 16533/68

With compliments of :

Farm Input & Output P. Ltd.

RANCHI IMPROVEMENT TRUST
BUILDING COURT COMPOUND
RANCHI-I

শ্রীমলিন দত্ত কর্তৃক জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স, ৫৯/২ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩০/১এ, কলেজ রো, কলি-৯ থেকে প্রকাশিত। Re. 1·00